রামব্রিজ! এ রামব্রিজ!—আরে, গেল কোথায় লোকটা? কোথায় ধেনো টেনে পড়ে আছে ব্যাটা। এ রামব্রিজ—

[হতাশ হয়ে পড়েন। টুলটা সোজা করে তার উপর বসেন। মোমবাতিটাকে মাটিতে রাখেন।]

—চারিদিক নিঃঝুম।—খালি আমার গলাটাই ঘুরেফিরে কানে বাজছে আমার। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে।—কাল রাতেও ঠিক একই ব্যাপার। মদ গিলে গ্রিনরুমে পড়েছিলুম। রামব্রিজই ঘুম থেকে তুলে ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছিল। তার দরুন আজ সন্ধেবেলা নগদ তিনটে টাকা বকশিশও দিলুম ওকে। আর তার ফল হল কী? না, সেই টাকায় তিনি নিজেই আজকে মদ গিলে কোথায় পড়ে আছেন। নিঘ্‌ঘাৎ মেইন গেটে তালা পড়ে গেছে।—আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে যা হোক। [মাথা ঝাঁকিয়ে]

উফ্‌, আজ রাতে কতটা গিলেছি? মাতালের এই হচ্ছে বিপদ। ছাড়ব বললে ছাড়ান নেই। আরে বাবা,—দিলুম, তোকে বকশিশ দিলুম, না উনি আবার সেই আনন্দে আমাকেই দেড় বোতল খাইয়ে গেলেন। এঃ, একেবারে রামধেনো। উফ বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে যে। মুখের ভেতরটা যেন অডিটোরিয়াম—ইন্টারভ্যালে সব দর্শকরা হাঁটাহাঁটি লাগিয়ে দিয়েছে—উঃ জিভটা টানছে কীরে বাবা।—[একটু থামেন]

অকারণ—অকারণে বাবা। কেউ যদি বলে, ''রজনীবাবু অনেক তো বয়েস হল, এবার মদ খাওয়াটা ছাড়ুন।'' কোনো জবাব আছে? উঁহু, রোজ দিন যায়, সন্ধে হয়, আর মদ খাই! উঃ ভগবান! শিরদাঁড়াটা গেল—বুকটা কী ভীষণ কাঁপছে—মনে হচ্ছে যেন—''রজনীবাবু ভাই, শরীরটার দিকে একটু নজর দিন—আর কী এ বয়েসে এত সয়? কত বুড়ো হয়েছেন ভাবুন দিকিনি—''[থামেন] হ্যাঁ, বুড়ো হয়েছেন বই-কি রজনীবাবু—আটষট্টিটা বছর কি নেহাৎ কম বয়েস, অ্যাঁ? ছোকরাদের মতো ঢং ঢাং করতে পারেন, লম্বাচওড়া চেহারাটা আছে, আরও চালিয়ে দেবেন কিছুদিন। লম্বা লম্বা চুলে ডেইলি হাফ শিশি কলপ লাগিয়ে যেরকম ইয়ার্কি টিয়ার্কি মারেন, তাতে বয়েসটা ঠিক বোঝা যায় না—কিন্তু যা গেল, সে কি আর ফিরবে? আটষট্টিটা বছর—এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে—আর জীবনে ভোর নেই, সকাল নেই, দুপুর নেই,—সন্ধেও ফুরিয়েছে—এখন শুধু মাঝরাত্তিরের অপেক্ষা—এখানেই গল্প শেষ। এরপর রজনীবাবু এসে বলবেন, ''আমি লাস্ট সিনে প্লে করব না ভাই, আমাকে ছেড়ে দিন।''---কিন্তু কার্টেন উঠবেই—শ্মশানঘাট—পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, ওপারের দূত উইংসে রেডি—[একটু থামেন। সামনের দিকে তাকান—হলের শেষ প্রান্তে।]

জানেন রজনীবাবু, এই পঁয়তাল্লিশ বছর থিয়েটারের জীবনে এই প্রথম মাঝরাতে একা—একেবারে একা—স্টেজে দাঁড়িয়ে আছি—জীবনে প্রথম। কেন জানেন?—এ হচ্ছে সবই মাতালের কারবার। [ফুটলাইটের কাছে যান]

—সামনেটা কিছু দেখা যায় না। ওই দূরে তো ব্যালকনি, না?

—ফার্স্ট বক্সটাও দেখতে পাচ্ছি এখন—ওই তো সেকেন্ড—থার্ড—ফোর্থ বক্সটাও—সব গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে—সব মিলিয়ে যেন একটা শ্মশান, যেন ওর দেয়ালে কালো কালো অঙ্গারে

লেখা আছে জীবনের শেষ কথাগুলো—কত নড়াচড়া, কত উদ্‌বেগ, কত প্রেম, কত মায়া। সব মিলিয়ে যেন মৃত্যুর নিঃঝুম ঘুমের আয়োজন করে রেখেছে কারা, উঃ কী শীত—সব আছে শুধু মানুষ নেই—সব ভূতুড়ে বাড়ির মতো খাঁ খাঁ করছে—মরে গেছে নাকি? শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে কীরকম শিরশির করছে যেন—[হঠাৎ চেঁচিয়ে] রামব্রিজ! রামব্রিজ! কাঁহা গ্যয়া রে—উঃ এই মাঝরাতে একা একা কীসব মৃত্যু, শ্মশান আবোলতাবোল ভাবছি। হবে না কেন? কম গিলেছি আজকে। ''মদটা ছেড়ে দিন রজনীবাবু, মদটা ছেড়ে দিন। বুড়ো হয়ে গেছেন, আর দু-দিন বাদেই খাটে উঠবেন মশাই। ধরুন, আপনার মতো বয়েস হয়েছে যাঁদের—আটষট্টিটা বছর, তাঁরা সময়মতো মাপজোখ করে খাওয়াদাওয়া করেন—সকাল-সন্ধে বেড়াতে যান, সন্ধেবেলা কেত্তনটেত্তন শোনেন, ভগবানের নাম করেন—আর আপনি রজনীবাবু এসব কী করছেন মশাই? মাঝরাতে দিলদারের পোষাক পরে, পেটভর্তি মদ গিলে, এসব থিয়েটারি ভাষায় কী আবোলতাবোল বলছেন বলুন তো? কেউ শুনলে ভয় পেয়ে যাবে যে,আন্দাজ করুন দিকি, আপনার চোখগুলো দেখতে এখন কেমন লাগছে। যান যান মেকআপ টেকআপ তুলে, চুলটুল আঁচড়ে, ভদ্র গোছের জামাকাপড় পরে বাড়ি যান দিকিনি। কী যে পাগলামি করেন। সারারাত ধরে এইসব ভাবলে হঠাৎ হার্টফেল করবেন যে।''—

[উইংস দিয়ে বেরিয়ে যেতে চান। যেই এগিয়েছেন অমনি দেখা গেল—পরনে ময়লা পাজামা, গায়ে কালো চাদর, এলোমেলো চুল, বুড়ো কালীনাথ সেন ঢোকেন। রজনীবাবু ভয়ে চিৎকার করে পিছিয়ে যান।] কে কী চাই তোমার? কী চাই?

[অর্ধেক রাগ, অর্ধেক মিনতি করে] কে? কে তুমি?

কালীনাথ : আমি।

রজনী : [এখনও ভয় পেয়ে] কে, নাম বলো?

কালীনাথ : [আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে] আমি চাটুজ্জেমশাই—আমি কালীনাথ—আপনাদের প্রম্পটার কালীনাথ—

[রজনীকান্ত অসহায় হয়ে টুলের উপর বসে পড়েন। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে থাকে, সারা শরীর কাঁপতে থাকে।]

রজনী : অ্যাঁ, কে? ও তুমি, তুমি কালীনাথ? তুমি এত রাতে কী করছিলে এখানে?

কালীনাথ : আমি রোজ লুকিয়ে গ্রিনরুমে ঘুমোই চাটুজ্জেমশাই—কেউ জানে না—আপনি বামুন-মানুষ, মিছে কথা বলব না—আপনার পায়ে ধরছি, এ কথাটা মালিকের কানে তুলবেন না চাটুজ্জেমশাই, আমার শোয়ার জায়গা নেই, একেবারে বেঘোরে মারা পড়ব তাহলে—

রজনী : ওহ, তুমি কালীনাথ! তাই বলো? বলো কালীনাথ, তুমি, কী হয়েছে জানো—আজকের শো-তে আমি সাতটা ক্ল্যাপ্‌ পেয়েছি—দু-বার তো স্পষ্ট শুনেছি, ''মাইরি, এই না হলে অ্যাকটিং!'' কে যেন একবার বললে, ''দেখছ, রজনী চাটুজ্জে ইজ্‌ রজনী চাটুজ্জে—মরা হাতি সোয়া লাখ।'' তাহলেই বুঝলে কালীনাথ, পাবলিক এখনও কীরকম ভালোবাসে আমাকে?—আসলে যতক্ষণ স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকি ততক্ষণ কদর। তারপর যে যার ঘরে যায়, তখন কে কার! কে-ই বা এই

বুড়ো মাতালটার খোঁজ করে, বলে, ''উঠুন রজনীবাবু, চলুন, বাড়ি যাবেন?'' কেউ বলে না।—

কালীনাথ : বাড়ি চলুন, আপনাকে আমি বাড়ি পৌঁছে দেব—

রজনী : কেন,—বাড়ি কেন,—কোথায়—

কালীনাথ : আপনার মনে পড়ছে না আপনার বাড়ি কোথায়?

রজনী : তা পড়েছে বই-কি! কিন্তু কী হবে বাড়ি ফিরে– একটুও ভালো লাগে না বাড়িতে! জানো কালীনাথ পৃতিবীতে আমি একা! আমার আপনজন কেউ নেই–বউ নেই, ছেলেমেয়ে নেই, সঙ্গীসাথি নেই, কেউ কোথাও নেই–আমি একদম একা–একেবারে নিঃসঙ্গ–কেমন জানো? ধু-ধু করা দুপুরে জ্বলন্ত মাঠে বাতাস যেমন একা–যেমন সঙ্গীহীন–তেমনি–আদর করে একটা কথা বলে, এমন কোনো লোক আছে আমার? মরবার সময় মুখে দু-ফোঁটা জল দেয় এমন কেউ নেই আমার। আর–জানো, যখনই এইসব কথা ভাবি, তখনই ভয়ে যেন বুকের ভেতরটা হিম হয়ে আসে আমার, তখন কেউ দুটো ভালো কথা বলে? কেউ কি এই বুড়ো মাতালটার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়? দেয় না। আমি কার? কে চায় আমাকে?

কালীনাথ : [জলভরা চোখে] পাবলিক তো আপনাকে ভালোবাসে চাটুজ্জেমশাই।—

রজনী : পাবলিক? এই মাঝরাতে পাবলিক এখন থিয়েটার দেখে-টেখে গিয়ে, টেনে ঘুম লাগাচ্ছে। তুমি কি ভাবছ পাবলিক আমাকে এমনই ভালোবাসে যে ঘুমের ঘোরে আমাকে স্বপ্ন দেখছে?—পাগল! আমাকে আর কেউ চায় না কালীনাথ, কেউ না—আমার ঘরসংসার, বউ-ছেলেমেয়ে, কেউ নেই—কিছু নেই—

কালীনাথ : কিন্তু তাই নিয়ে আপনার মতো লোকের এত দুঃখ চাটুজ্জেমশাই—

রজনী : কেন, আমিও তো মানুষ কালীনাথ। হাত-পা-ওয়ালা একটা জ্যান্ত মানুষ। আমারও তো আর পাঁচজনের মতো হাত-পা আছে। আমার শিরায় শিরায় কি জল বইছে? রক্ত বইছে না? সদ্বংশের পবিত্র রক্ত।—বিশ্বাস করো কালীনাথ, আমি একটা উঁচুবংশে, রাঢ়ের সবচেয়ে প্রাচীন ভদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিলুম। এ লাইনে আসার আগে আমি পুলিশের চাকরিতে ঢুকেছিলুম—ইন্স্পেক্টর অফ পুলিশ। আর কী চেহারাই না ছিল আমার। ছোকরা বয়স তো? তখন চেহারায় জেল্লা ছিল, কাউকে তোয়াক্কা করতুম না, শরীরে শক্তি ছিল, মনে সাহস ছিল, আজকের চার ডবল কাজ করতে পারতুম একাই—তারপর একদিন, বুঝলে—চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। আর একরকম করে জীবন শুরু করা গেল, নাটক নিয়ে—সেসব দিনের কথা কি তোমার মনে আছে কালীনাথ? তখন কী নামডাকই ছিল আমার! কী খাতির! কী প্রতিপত্তি! তারপর সেসব দিনও যেন কবে—কেমন করে ফুরিয়ে গেল, একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ে গেল হে আমাকে—

[দাঁড়িয়ে কালীনাথের গায়ে ভর দিয়ে]

জানো, আগে আমি বুঝতে পারিনি; হঠাৎ এই মাঝরাতে আমি যখন এই stage-এর উপর এসে দাঁড়ালুম, থিয়েটার-এর Black-Wall-এর দিকে তাকালুম, এই একটু আগে সামনের ওই অন্ধকারের দিকে চেয়েছিলুম—হঠাৎ আমার মনে হল, কে যেন আমার জীবনের সমস্ত খাতাখানাকে, আমার চোখের সামনে মেলে ধরেছে। থিয়েটারের দেয়ালে দেয়ালে অঙ্গারের গভীর কালো অক্ষরে

লেখা, আমার জীবনের পঁয়তাল্লিশটা বছর কালীনাথ—কী জীবন!—ওই অন্ধকারে আশ্চর্য স্পষ্ট সেসব অক্ষর—আমি দেখলুম কালীনাথ—যেমন স্পষ্ট তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি এখন—ঠিক তেমনি—তেমনি স্পষ্ট—আমি একে একে সব পার হয়ে যেতে দেখলুম—আমার যৌবন, আদর্শ, শক্তি, সম্ভ্রম, প্রেম—নারী! —হ্যাঁ একটা মেয়ে! জানো, কালীনাথ, একটা মেয়ে!—

কালীনাথ : ঘুম পাচ্ছে? ঘুমোবেন চাটুজ্জেমশাই?

রজনী : তখন আমার বয়স বেশি নয়—সবে এ লাইনে এসেছি, সারা দেহ-মনে ফুটছে টগবগ করে উৎসাহ। একদিন একটা মেয়ে থিয়েটার দেখে প্রেমে পড়ল আমার!—বিশ্বাস করো, সে বেশ বড়োলোকের মেয়ে, বেশ সুন্দর দেখতে ছিল মেয়েটা, ওর বাপের টাকাপয়সাও ছিল অঢেল,—মেয়েটা বেশ লম্বা, ফরসা, সুন্দর, ছিপছিপে গড়নের, উঠতি বয়স—আর মনটা ছিল দারুণ ভালো, কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই—সব ভালো তার—কিন্তু—ওরই মধ্যে কোথায় যেন আগুন লুকিয়ে ছিল—গ্রীষ্মের বিকেলে পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের মেঘ যে আগুন লুকিয়ে রাখে, সেই আগুন। কালীনাথ, সে কী আশ্চর্য মেয়ে কেমন করে বোঝাব তোমাকে? এমন গভীর ওর টানাটানা কালো চোখ যে অন্ধকার রাতে একা একা ভাবলে মনে হত সে যেন কোনো অচেনা দিনের আলো। কী অদ্ভুত হাসি তার। কী তার ঢেউখেলানো রাশি রাশি কালো চুল। দাঁড়াও, ওর চুলগুলোর কথা বুঝিয়ে বলি তোমাকে! সমুদ্রের ঢেউ দেখেছ তো? মনে হয় না ঢেউ-এ ঢেউ-এ কী আশ্চর্য শক্তি! কিন্তু জানো, যদি তোমার বয়স কম হত, যদি দৃষ্টি থাকত তোমার, যদি দেখতে ওর রাশি রাশি কালো চুলের ঢেউ, তাহলে তোমার ধারণা হত—কেমন করে দুর্গম পাহাড়কে ধ্বসিয়ে দেয় পাহাড়ি নদীর দুর্গম খরস্রোত—কোন অমোঘ শক্তির গতিতে সমস্ত পাহাড় থরথর করে উঠে তীব্র আক্ষেপে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, মুহূর্তে প্রলয় ঘটে যায় পৃথিবীতে, তখন কি মনে হত না তোমার—এ ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তো যাক আমাকে উলটেপালটে দিয়ে যদি জীবনের খেলা খেলতে চায়, তো খেলুক!—সত্যি জানো, হঠাৎ মনে হয়, আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমি যেন ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক যেমন এখন তুমি দাঁড়িয়ে আছ আমার সামনে!— আর একদিন—আর একদিন তাকে দেখে মনে হয়েছিল—ভোরের আলোর চেয়েও সুন্দর সে! সেই যে তার আমার দিকে সেই একরকম অদ্ভুত করে চেয়ে থাকা, মরে যাব তবু ভুলব না, তার সেই আশ্চর্য ভালোবাসা। ও শুধু আমাকে আলমগিরের পার্ট করতে দেখেছিল—আর কিছু নয়—আমার নিজের থেকে ওকে কোনো কথা বলতে হয়নি, রেখে, ঢেকে, সত্যি, মিথ্যে, কোনো কথা না। একদিন যেচে আলাপ করল আমার সঙ্গে, তারপর ক্রমশ আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা—ঘনিষ্ঠতা থেকে প্রেম। আর তখনকার দিনে আমার অ্যাকটিং মানে, সে একটা ব্যাপার। তখন তো আমার বয়সও বেশি না, সামনে পড়ে রয়েছে ব্রিলিয়ান্ট ফিউচার। তখন নিজের ওপর কত জোর ছিল হে! তখন মনে মনে কত আশা, কত প্ল্যান! একদিন ওকে বললাম, ‘‘অনেক দিন তো আলাপ হল আমাদের, চলো এবার বিয়ে করি আমরা, এমনি করে আর কদ্দিন থাকব আমরা। এবার আমাদের বিয়ের কথাটা তোমার বাবাকে বলি একদিন?’’

[গলার স্বর ডুবে যায়]

ও কী বলল জানো? ‘‘হ্যাঁ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, চলো বিয়ে করি, কিন্তু তার আগে তুমি ওই থিয়েটার করা ছেড়ে দাও।’’ থিয়েটার করা ছেড়ে দেব?...কেন? ও যে বড়োলোকের সুন্দরী

মেয়ে, থিয়েটারের লোকের সঙ্গে জীবনভর প্রেম করতে পারে, কিন্তু বিয়ে? নৈব নৈব চ! আমার মনে আছে, সে রাত্তিরে কী যে পার্ট করছিলুম, কী যেন কী একটা...বাজে হাসির বই—স্টেজে দাঁড়িয়ে পার্ট করতে করতে হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেল। সেই রাত্রেই জীবনে প্রথম মোক্ষম বুঝলুম যে, যারা বলে 'নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প'—তারা সব গাধা—গাধা। তারা সব মিথ্যে কথা—বাজে কথা বলে। অভিনেতা মানে একটা চাকর—একটা জোকার, একটা ক্লাউন। লোকেরা সারাদিন খেটেখুটে এলে তাদের আনন্দ দেওয়াই হল নাটক-ওয়ালাদের একমাত্র কর্তব্য। মানে এককথায়—একটা ভাঁড় কি মোসায়েবের যা কাজ তাই। আর সেইদিনই বুঝলুম পাবলিকের আসল চরিত্রটা কী! তারপর থেকে ওসব ফাঁকা হাততালিতে, খবরের কাগজের প্রশংসায়, মেডেল, সার্টিফিকেটে, 'নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প'—এসব বাজে কথায় আমি বিশ্বাস করি না। পাবলিক মহোদয় আলবত হাততালি দেবেন—খুব প্রশংসা করবেন—সব ঠিক—কিন্তু যেই তুমি স্টেজ থেকে নামলে—তুমি তাঁদের কেউ না—তুমি থিয়েটারওয়ালা—একটা নকলনবীশ—একটা অস্পৃশ্য ভাঁড়,—তা বলে কি তাঁরা তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন না, চা সিগারেট খাওয়াবেন না? তা খাওয়াবেন। অনেক কথা বলবেন, আলাপ-আলোচনা করবেন, হাসবেন, নমস্কার করবেন—তা নইলে বাইরে জাহির করবেন কী করে? ''ও অমুক আর্টিস্ট! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে আমি চিনি, ওর সঙ্গে আমার খুব খাতির, উনি তো সেদিন অবধি আমার ঘরে—'' সব ঠিক। কিন্তু কোনো সামাজিক সম্মান তুমি পাবে না। থিয়েটারের পরিচয়ে কেউ তার মেয়ে কিংবা বোনের সঙ্গে বিয়ে দেবে কারও? কক্ষনো না। জানো, তোমার ওই পাবলিক, মানে থিয়েটারের টিকিট-কেনা খদ্দেরদের আমি, কাউকে বিশ্বাস করি না।

কালীনাথ : পুরোনো দিনের কথা ভুলে যান চাটুজ্জেমশাই। শুধু শুধু মন খারাপ করে কী হবে! চলুন বাড়ি নিয়ে যাই আপনাকে—

রজনী : 'নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প!' এই পবিত্রতার নামাবলিটা সেদিন হঠাৎই ফাঁস হয়ে গেল আমার সামনে—হঠাৎ।—আর তারপর থেকে—সেই মেয়েটা—কী হল কে জানে। আমারও আর কিছু ভালো লাগত না—ভবিষ্যতের চিন্তা-টিন্তা সব—বই বাছাই-ফাছাই মাথায় উঠে গেল, আবোলতাবোল সব পার্ট করতে লাগলাম—সেসব যা-তা পার্ট। লোকের মুখে শুনলাম, জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে, এইসব দেখেটেখেই নাকি দেশের ছোঁড়াগুলো গোল্লায় যাচ্ছে। তবু যেই স্টেজে নেমেছি, তখন ওইসব জ্ঞানী ব্যক্তিরাই বলেছেন, 'বাঃ বাঃ দারুণ! কী ট্যালেন্ট!' ধুত্তোর নিকুচি করেছে ট্যালেন্টের! আস্তে আস্তে বয়স বাড়ল, গলার কাজ নষ্ট হয়ে গেল, একটা নতুন চরিত্রকে বোঝবার, ফুটিয়ে তোলবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেল, থিয়েটারের দেয়ালে দেয়ালে কার অদৃশ্য হাত, অঙ্গারের কালো কালো জ্বলন্ত অক্ষরে লিখে দিয়ে গেল প্রাক্তন অভিনেতা রজনী চাটুজ্জের প্রতিভার অপমৃত্যুর করুণ সংবাদ! আমি আগে বুঝতে পারিনি জানো!—আজ রাতে—সবে হঠাৎ—ঘুম থেকে চমকে জেগে উঠে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম কথাটা। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখি—অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে,—আমারই জীবনের আটষট্টিটা বছর—আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো রজনী চাটুজ্জে—আর ক-পা এগোলেই শ্মশানের চিতার আঁচ লাগবে গায়। [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] ঝলসে দেবে আমাকে—

কালীনাথ : পুরোনো দিনের কথা ভুলে যান চাটুজ্জেমশাই, পুরোনো দিনের কথা ভুলে যান। আপনি চুপ করে বসুন এখানে। আর কিছু ভাববেন না। ভগবান আছেন চাটুজ্জেমশাই। অদৃষ্ট তো মানেন আপনি। [চেঁচিয়ে] রামব্রিজ! রামব্রিজ!

রজনী : [হঠাৎ জেগে] সেসব দিনে কী না পারতাম। যেমন খুশি তাই পারতাম! তোমার মনে আছে সেসব দিনের কথা? –কী সহজে এক-একটা চরিত্র বুঝতে পারতাম–কী আশ্চর্য সব নতুন রঙের চরিত্রগুলো চেহারা পেত—কী অসীম বিশ্বাসে ভরা ছিল [বুকে ঘা মেরে] এ জায়গাটা।—শোনো হে, শোনো তো বলি। দাঁড়াও, একটু দম টেনে নিই আগে—মনে আছে, 'রিজিয়া' নাটকে বক্তিয়ারের সিনটা—?

''শাহাজাদি! সম্রাটনন্দিনী! মৃত্যুভয় দেখাও কাহারে?

জাননা কি তাতার-বালক মাতৃ অঙ্ক হতে ছুটে যায়

সিংহশিশু-সনে করিবারে মল্লরণ?

শাণিত ছুরিকা ক্ষুদ্র ক্রীড়নক তার!

জীবনের ভয় দেখাও সম্রাজ্ঞী?

বক্তিয়ার মরিতে প্রস্তুত সদা।''

খুব খারাপ হচ্ছে না, কী বলো? আচ্ছা, ওই সিনটা মনে আছে তোমার? সেই যে ডি. এল. রায়ের 'সাজাহান' নাটকে ঔরঙ্গজীব আর মহম্মদের সিনটা?—প্রথম ঔরঙ্গজীব একা—

''বড়ো ভয়ংকর এ যোগ। শাহ্নাওয়াজ আর যশোবন্ত সিংহ। আমি কিন্তু প্রধান আশঙ্কা করছি এই মহম্মদকে। তার চেহারা—কম কথা কয়। আমার প্রতি একটা অবিশ্বাসের বীজ তার মনে কে বপন করে দিয়েছে। জাহানারা কি?—এই যে মহম্মদ!'' [অধৈর্য হয়ে] আঃ! কাম অন, কুইক! মহম্মদের ক্যাচটা দাও তো, মহম্মদের ক্যাচ্‌টা।

কালীনাথ : ''পিতা আমায় ডেকেছিলেন?''

রজনী : ''হ্যাঁ, আমি কাল রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছি, তুমি সুজার অনুসরণ করবে।
মিরজুমলাকে তোমার সাহায্যে রেখে গেলাম।''

কালীনাথ : ''যে আজ্ঞা পিতা।''

রজনী : ''আচ্ছা যাও। দাঁড়িয়ে রইল যে? এ বিষয়ে কিছু বলবার আছে?''

কালীনাথ : ''না পিতা। আপনার আজ্ঞাই যথেষ্ট।''

রজনী : ''তবে?''

কালীনাথ : ''আমার একটা আরজি আছে পিতা।''

রজনী : ''কী!—চুপ করে রইলে যে। বলো পুত্র!''

কালীনাথ : ''কথাটা অনেকদিন থেকে জিজ্ঞাসা করব মনে করছি, কিন্তু এ সংশয় আর বক্ষে চেপে রাখতে পারি না। ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন।''

রজনী : ''বলো।''

কালীনাথ : ‘‘পিতা! সম্রাট সাজাহান কি বন্দি?’’

রজনী : ‘‘না! কে বলেছে?’’

কালীনাথ : ‘‘তবে তাঁকে প্রাসাদে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে কেন?’’

রজনী : ‘‘সেরূপ প্রয়োজন হয়েছে।’’

কালীনাথ : ‘‘আর ছোটো কাকা?’’

রজনী : ‘‘মোরাদ?’’

কালীনাথ : ‘‘তাঁকে এরূপে বন্দি করে রাখা কি প্রয়োজন?’’

রজনী : ‘‘হ্যাঁ।’’

কালীনাথ : ‘‘আর আপনার এই সিংহাসনে বসা—পিতামহ বর্তমানে?’’

রজনী : ‘‘হ্যাঁ পুত্র।’’

কালীনাথ : ‘‘পিতা।’’

রজনী : ‘‘পুত্র! রাজনীতি বড়ো কূট। এ বয়সে তা বুঝতে পারবে না। সে চেষ্টা কোরো না।’’

কালীনাথ : ‘‘পিতা! ছলে সরল ভ্রাতাকে বন্দি করা, স্নেহময় পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করা, আর ধর্মের নামে এসে এই সিংহাসনে বসা—এর নাম যদি রাজনীতি হয়, তাহলে সে রাজনীতি আমার জন্য নয়।’’

রজনী : আগেকার দিনে যে-পার্টগুলো করেছি সেগুলো এখন দাঁড়িয়ে বলতে-বলতে, শুনতে শুনতে, ভেতরটা যেন কেমন করে, না? আচ্ছা, তুমি আমাকে আর একটা জায়গা মনে করিয়ে দাও তো! পুরোনো দিনের যে-কোনো নাটকের যে-কোনো জায়গা—ধরো—ধরো ‘সাজাহান’ নাটকের ঔরঙ্গজীবের সেই ভয়ংকর সিনটা, যখন সবাইকে খুন করে ঔরঙ্গজীব সিংহাসন পেয়েছেন—তখন একদিন মাঝরাতে ঔরঙ্গজীব একা—একেবারে একা—ভাবছেন—‘‘যা করেছি ধর্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হত।—উঃ কী অন্ধকার! কে দায়ী? আমি!—এ বিচার! ও কী শব্দ?—না, বাতাসের শব্দ। এ কী! কোনোমতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর করতে পাচ্ছি না। রাত্রে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি। কিন্তু নিদ্রা আসে না—উঃ কী স্তব্ধ। এত স্তব্ধ কেন? ও কী!—ও কী! আবার সেই দারার ছিন্ন শির।—সুজার রক্তাক্ত দেহ।—মোরাদের কবন্ধ। যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ওই তারা আবার আমায় ঘিরে নাচছে! —কে তোমরা? জ্যোতির্ময়ী ধূমশিখার মতো মাঝে মাঝে জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও! চলে যাও! মোরাদের কবন্ধ আমায় ডাকছে। দাদার মুণ্ডু আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাসছে—এ কী সব! ওঃ।’’

[হাততালি দিয়ে জোরে হেসে ওঠেন]

সাব্বাশ! সাব্বাশ! এখন বয়েসগুলো কোন্ চুলোয় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হে! কোথায় গেল আটষট্টিটা বছরের শোক! কোথায় চিতার আঁচটা!—আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি কালীনাথ, আমার প্রতিভা এখনও মরেনি,—শরীরে যদি রক্ত থাকে, তাহলে সে রক্তে মিশে আছে প্রতিভা।—এর নাম যদি যৌবন না হয়, শক্তি না হয়, জীবন না হয়, তাহলে জীবন বস্তুটা কি কালীনাথ? প্রতিভা যার আছে, বয়েসে তার কী আসে যায়! এই তো জীবনের সত্য কালীনাথ—আমার অ্যাকটিং তোমার—তোমার ভালো লেগেছে—না? সত্যি ভালো লেগেছে—না?—আমার আরও মনে আছে,

জানো! সেই শান্ত গভীর পূর্ণতার কথা—শোনো জীবনের শেষ যুদ্ধযাত্রার আগের রাতে সুজার সেই কথাগুলো—পিয়ারাবানুকে বলা—'আজ তবে হাসো, কথা কও, গাও যা দিয়ে আমাকে এতদিন ছেয়ে দিতে, ঘিরে বসে থাকতে! একবার শেষবার দেখে নেই, শুনে নেই। তোমার বীণাটি পাড়ো! গাও—স্বর্গ, মর্ত্যে নেমে আসুক। ঝঞ্ঝাতে আকাশ ছেয়ে দাও। তোমার সৌন্দর্যে একবার এ অন্ধকারকে ধাঁধিয়ে দাও দেখি। তোমার প্রেমে আমাকে আবৃত করে দাও। বোসো, আমি আমার অশ্বারোহীদের বলে আসি। আজ সারারাত্রি ঘুমাব না।" [বাইরে দরজা খোলার শব্দ] কে?

কালীনাথ : এ নিশ্চয় রামব্রিজ! আপনার প্রতিভা এখনও মরেনি চাটুজ্জ্যেমশাই। ঠিক পুরোনো দিনের মতোই আছেন আপনি। পুরোনো দিনের মতো—

রজনী : [দরজার শব্দের দিকে চেঁচিয়ে] ইধর, এ রামব্রিজ, সিধে ইস্টেজ পর চলে আও। [কালীনাথকে] বয়েস বেড়েছে তো কী হয়েছে কালীনাথ? এই তো জীবনের নিয়ম! [আনন্দে হেসে ওঠেন] আরে তুমি কাঁদছ কালীনাথ! তোমার চোখে জল, কেন বল তো? আরে এসো এসো, দুর কাঁদে নাকি? [বুকে জড়িয়ে ধরে জলভরা চোখে] শিল্পকে যে-মানুষ ভালোবেসেছে—তার বার্ধক্য নেই কালীনাথ, একাকীত্ব নেই, রোগ নেই, মৃত্যুভয়ের উপর সে তো হাসতে হাসতে ডাকাতি করতে পারে—[চোখের জল গড়িয়ে পড়ে] হ্যাঁ কালীনাথ, আমাদের দিন ফুরিয়েছে। হায়রে প্রতিভা! কোথায় গেল বলো তো? জীবনের পাত্র শূন্যতায় রিক্ত করে দিয়ে, কোথায়, কার কাছে, কোন দেশে গেল প্রতিভা? যাবার আগে মজলিশি গল্পের আস্তাকুঁড়ে নির্বাসন দিয়ে গেল আমাকে!—আর তুমি! সারা জীবন থিয়েটারের প্রম্পটার হয়েই তোমার জীবন ফুরিয়ে গেল!—চলো কালীনাথ, চলো যাই—[যেতে আরম্ভ করে] জানো, সত্যি কথা বলতে কী, ওসব প্রতিভা-টতিভা আমার কিছু নেই—দিলদারের পার্টটা মন্দ করি না—তাও আর বছর কয়েক পরে মানাবে না আমাকে, তাই না? অতএব ওথেলোর সেই কথাগুলো মনে আছে তোমার! সেই যে—

Oh, now forever
Farewell the tranquil mind! farewell content!
Farewell the plumed troops, and the big wars
That makes ambition virtue! O, farewell!
Farewell the neighing steed and the shrill trump,
The spirit-stirring drum, th'ear-piercing fife.
The royal banner, and all quality,
Pride, pomp, and circumstance, of glorious war!

কালীনাথ : আমি বলছি রজনী চাটুজ্জে মরবে না—কিছুতেই না—

রজনী : কিংবা ধরো—

Life's but walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more.

[একেবারে নেপথ্যে]

A horse! A horse! My kingdom for a horse!

আন্তর্জাতিক কবিতা

পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন

বের্টোল্ট ব্রেখ্ট

কে বানিয়েছিল সাত দরজাঅলা থিব্‌স্? বইয়ে লেখে রাজার নাম।
রাজারা কি পাথর ঘাড়ে করে আনত?
আর ব্যাবিলন এতবার গুঁড়ো হল, কে আবার গড়ে তুলল এতবার?
সোনা-ঝকঝকে লিমা যারা বানিয়েছিল তারা থাকত কোন্ বাসায়?
চিনের প্রাচীর যখন শেষ হল সেই সন্ধ্যায় কোথায় গেল রাজমিস্ত্রিরা?
জয়তোরণে ঠাসা মহনীয় রোম।
বানাল কে? কাদের জয় করল সিজার?
এত যে শুনি বাইজেনটিয়াম, সেখানে কি সবাই প্রাসাদেই থাকত?
এমনকী উপকথার আটলান্টিস, যখন সমুদ্র তাকে খেল
ডুবতে ডুবতে সেই রাতে চিৎকার উঠেছিল ক্রীতদাসের জন্য।

ভারত জয় করেছিল তরুণ আলেকজান্ডার।
একলাই না কি?
গল্‌দের নিপাত করেছিল সিজার। নিদেন একটা রাঁধুনি তো ছিল?
বিরাট আর্মাডা যখন ডুবল, স্পেনের ফিলিপ কেঁদেছিল খুব।
আর কেউ কাঁদেনি?
সাত বছরের যুদ্ধ জিতেছিল দ্বিতীয় ফ্রেডারিক।
কে জিতেছিল? একলা সে?
পাতায়-পাতায় জয়
জয়োৎসবের ভোজ বানাত কারা?
দশ-দশ বছরে এক-একজন মহামানব
খরচ মেটাত কে?
কত সব খবর!
কত সব প্রশ্ন!

ভাষান্তর : শঙ্খ ঘোষ

ভারতীয় গল্প

অলৌকিক

কর্তার সিং দুগ্‌গাল

‘তারপর গুরু নানক ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছোলেন হাসান আব্দালের জঙ্গলে। ভয়ানক গরম পড়েছে। গনগনে রোদ। চারিদিক সুনসান। পাথরের চাঁই, ধু ধু বালি, ঝলসে যাওয়া শুকনো গাছপালা। কোথাও একটা জনমানুষ নেই।’

‘তারপর কী হল মা?’ আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি।

‘গুরু নানক আত্মমগ্ন হয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ শিষ্য মর্দানার জল তেষ্টা পেল। কিন্তু কোথায় জল? গুরু বললেন, ভাই মর্দানা, সবুর করো। পরের গাঁয়ে গেলেই পাবে।’ কিন্তু তার কাকুতি-মিনতি শুনে গুরু নানক দুশ্চিন্তায় পড়লেন। অনেক দূর পর্যন্ত জল পাওয়া যাবে না, অথচ সে বেঁকে বসলে সবাইকেই ঝক্কি পোয়াতে হবে। গুরু বোঝানোর চেষ্টা করলেন, ‘দ্যাখো মর্দানা, কোথাও জল নেই, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করো। এটাকে ভগবানের অভিপ্রায় বলেই মেনে নাও।’ মর্দানা তবু নড়তে রাজি নয়। সেখানেই বসে পড়ে। এগুবার আর উপায় নেই। গুরু গভীর সমস্যায় পড়লেন। মর্দানার একগুঁয়েমি দেখে হাসি পেলেও সেই সঙ্গে বিরক্তও হলেন। পরিস্থিতি দেখে ধ্যানে বসলেন তিনি। চোখ খুলে দেখেন, মর্দানা তেষ্টার চোটে জল ছাড়া মাছের মতো ছটফট করছে। সদ্‌গুরু তখন ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বললেন, ‘ভাই মর্দানা, এখানে পাহাড়ের চুড়োয় বলী কান্ধারী নামে এক দরবেশ কুটির বেঁধে থাকেন। ওঁর কাছে জল পেতে পার। এ তল্লাটে ওঁর কুয়ো ছাড়া আর কোথাও জল নেই।’

'তারপর কী হল মা?' মর্দানা জল পেল কিনা জানবার আর তর সইছিল না।

'মর্দানা শুনেই ছুটে গেল। একে তেষ্টায় কাতর, তার উপর মাথায় গনগনে রোদ। ঘেমে নেয়ে পাহাড়ে উঠছে। হাঁপাতে হাঁপাতে শেষ অবধি অনেক কষ্টে উঠতে পারল। বলী কান্ধারীকে সেলাম জানিয়ে জল চাইলে তিনি কুয়োর দিকে ইঙ্গিত করলেন। সে কুয়োর দিকে এগুলে হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগল ওর মনে। জিজ্ঞেস করলেন, কোত্থেকে আসছ? মর্দানা জানায়, আমি পির নানকের সঙ্গী। ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে পড়েছি। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু নীচে কোথাও জল নেই।' নানকের নাম কানে যেতেই বলী রেগে তাকে সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দিলেন। নেমে সে নালিশ জানাল। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে গুরু হাসেন, 'মর্দানা তুমি আর একবার যাও। এবার নম্রভাবে বলবে, আমি নানক দরবেশের অনুচর'। তার ভয়ংকর তেষ্টা পেয়েছে, অন্য কোথাও জল নেই। ক্ষোভে দুঃখে বিড়বিড় করতে করতে সে আবার গেল। কিন্তু বলী কান্ধারী 'আমি কাফেরের শিষ্যকে এক গণ্ডুষ জলও দেব না' বলে এবারও তাড়িয়ে দিলেন। মর্দানা এবার যখন ফিরল, তখন রীতিমতো করুণ অবস্থা। গলা শুকিয়ে ফেটে যাচ্ছে, দরদর করে ঘামছে। বেশিক্ষণ বাঁচাবে কি না সন্দেহ। গুরু নানাক সব শুনে মর্দানাকে 'জয় নিরঙ্কার' বলে ওঁর কাছে আর একবার যেতে বললেন। আদেশ অমান্য করতে না পেরে সে ফের রওনা দিল। যা অবস্থা, হয়তো পথেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। তিন বারের বার চুড়োয় পৌঁছেই মর্দানা ওঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ ফকির এবারও কাকুতিমিনতি অগ্রাহ্য করলেন, 'ওই নানক নিজেকে পির বলে জাহির করে অথচ চেলার জন্য সামান্য খাবার জলও জোগাড় করতে পারে না।' বলী কান্ধারী যথেচ্ছ গালাগাল করলেন। মর্দানা নেমে এসে গুরু নানকের পায়ে প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ল। পিঠে হাত বুলিয়ে, সাহস জুগিয়ে উনি তাকে সামনের পাথরটা তুলতে বলেন। পাথরটা তোলায় তলা থেকে জলের ঝরণা বেরিয়ে এল। নিমেষেই চারিদিকে থৈ থৈ। ঠিক সেই সময় বলী কান্ধারীর জলের দরকার হয়েছে। দেখেন, কুয়োয় একটুও জল নেই। উনি রীতিমত হতভম্ব। ওদিকে নীচে জলস্রোত দেখা দিয়েছে। বলী কান্ধারী দেখলেন, গুরু নানক দূরে বাবলাতলে অনুচরসহ বসে রয়েছেন। ক্ষিপ্ত হয়ে বলী পাথরের একখানা চাঙড় নীচে গড়িয়ে দেন। দৃশ্যটা দেখে মর্দানা চেঁচিয়ে উঠতেই গুরু নানক শান্ত স্বরে 'জয় নিরঙ্কার' ধ্বনি দিতে বলেন। কাছে আসতেই উনি হাত দিয়ে পাথরটা থামিয়ে দিলেন। হাসান আব্দালে এখন যার নাম 'পাঞ্জা সাহেব', গুরু নানকের হাতের ছাপ ওতে আজও লেগে রয়েছে।

গল্পটা শুনতে বেশ ভালো লাগছিল। কিন্তু হাত দিয়ে পাথরের চাঙড় থামিয়ে দেবার ব্যাপারটা মেজাজ বিগড়ে দিল। এ কি আদৌ সম্ভব? একটা মানুষ কীভাবে পাথরের চাঙড় থামিয়ে দেবে? ওতে কিনা আজো হাতের ছাপ লেগে আছে! বিশ্বাস হল না, 'মনে হয় পরে কেউ খোদাই করেছে', মা-র সঙ্গে তর্ক শুরু করি। পাথরের তলা থেকে জল বেরিয়ে আসার ব্যাপারটা মেনে নেওয়া যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জলের উৎস আবিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া চাঙড় হাত দিয়ে থামিয়ে দেওয়া কিছুতেই বিশ্বাস হল না। মুখের ভঙ্গিতে মনের ভাবটা ফুটে ওঠায় মা চুপ করে গেলেন।

'গড়িয়ে পড়া পাথর কীভাবে থামবে?' গল্পটা মনে পড়লেই হাসি পেত।

গল্পটা বার কয়েক গুরুদ্বারেতেও শুনেছি। কিন্তু এই ব্যাপারটাতে সবসময়েই মাথা বাঁকিয়েছি। এটা অসম্ভব।

গল্পটা আমাদের স্কুলে শোনানো হল। পাথরের ব্যাপারটা নিয়ে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গেও তর্ক করলাম। 'যারা পারে তাদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব না' বলে উনি আমাকে চুপ করিয়ে দিলেন।

তবু বিশ্বাস হল না। পাথরের চাঙড় কেউ থামাতে পারে? আমার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা করত।

কিছুদিন পর শুনলাম, পাঞ্জাসাহেবে ‘সাকা’ হয়েছে। সেকালে ঘনঘন ‘সাকা’ হত। কোথাও সাকা হলেই বুঝতে পারতাম, বাড়িতে অরন্ধন। রাতে মেঝেতে শুতে হবে। তবে সাকা আসলে কী, তখন জানতাম না।

আমাদের গাঁ থেকে পাঞ্জাসাহেব তেমন দূরে না। সাকার খবর পাওয়া মাত্র মা পাঞ্জাসাহেবের দিকে রওনা দিল। সঙ্গে আমি আর আমার ছোটোবোন। সারাটা পথ ধরে মা কেঁদেছিল। সাকার ব্যাপারটা কী, সারাক্ষণ ধরে তাই ভাবছি। পাঞ্জাসাহেবে পৌঁছে এক আশ্চর্য ঘটনার কথা জানতে পারি।

দূরের শহরের ফিরিঙ্গিরা নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর গুলি করেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই আছে মৃতদের মধ্যে। বাকিদের অন্য শহরের জেলে পাঠানো হচ্ছে। কয়েদিদের যদিও খিদে-তেষ্টায় সব মরার মতো অবস্থা, তাও হুকুম হয়েছে, তাদের ট্রেন যেন কোথাও না থামে। পাঞ্জা সাহেবের লোকজন খবরটা পেয়ে সবাই উত্তেজিত।

পাঞ্জা সাহেবেই গুরু নানক মর্দানার তেষ্টা মিটিয়েছিলেন। সেই শহর দিয়ে খিদে-তেষ্টায় কাতর কয়েদিদের ট্রেন যাবে এ হতে পারে না! ঠিক হল, ট্রেনটা থামানো হবে। স্টেশনমাস্টারের কাছে আবেদন জানানো হল। টেলিফোন, টেলিগ্রাম গেল। তবু ফিরিঙ্গিদের হুকুম, কিছুতেই ট্রেনটাকে থামানো যাবে না। এদিকে ট্রেনের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশপ্রেমিকেরা খিদেয় কাতর। জল, রুটির ব্যবস্থা নেই। সেখানে ট্রেন থামানোর কোনো ব্যবস্থা হয়নি। তবু লোকজন ট্রেন থামাতে বদ্ধপরিকর। শহরবাসীরা তাই স্টেশনে রুটি, পায়েস, লুচি-ডাল ডাঁই করে রাখে।

কিন্তু ট্রেনটা ঝড়ের বেগে স্টেশন পেরিয়ে যাবে। কী করা যায়?

মায়ের বান্ধবী আমাদের সমস্ত ঘটনাটা শোনালেন, ‘রেললাইনে আমার ছেলেপুলের বাবা ও তারপর ওঁর সঙ্গীরা শুয়ে পড়লেন। ওঁদের পেছনে এক-একজন করে আমরা বউ ও বাচ্চারা। তীক্ষ্ণ হুইসেল দিতে দিতে ট্রেন এল। গতি আগেই কমিয়েছে কিন্তু থামল অনেক দূরে এসে। দেখি ওর বুকের উপর দিয়ে চাকা, তারপর ওঁর সঙ্গীদের বুকের উপর দিয়ে আমি চোখ বুঁজলাম। চোখ খুলে দেখি ট্রেনটা একেবারে আমার মাথার কাছে এসে থেমেছে। পাশে শুয়ে থাকা সকলের বুক থেকে জয় নিরঙ্কার ধ্বনি বেরুচ্ছে। ট্রেনটা পিছোতে লাগল, লাশগুলো কেটে দুমড়ে মুচড়ে গেল। স্বচক্ষে দেখেছি, খালপারের সেতুটির দিকে রক্তের স্রোত।

অবাক-বিহ্বল বসে আছি, মুখে কথা নেই। সারাদিন একফোঁটা জলও মুখে দিতে পারিনি।

সন্ধ্যায় ফেরার পথে মা ছোটোবোনকে পাঞ্জাসাহেবের গল্প বলছিল। গুরু নানক মর্দানার সঙ্গে কীভাবে এ রাস্তায় এসেছিলেন। তেষ্টা পেলে গুরু নানক কোন পরিস্থিতিতে তাকে বলী কান্ধারীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বলী কান্ধারী কীভাবে তিন-তিনবার মর্দানাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। গুরু নানক তাকে কখন পাথর তুলতে বলেন। কীভাবে মাটি ফুঁড়ে ঝরনা বেরিয়ে আসে। তাতে বলী কান্ধারী ক্ষিপ্ত হয়ে পাথরের বড়ো চাঙড় গড়িয়ে দেয়। মর্দানা ঘাবড়ে গেলেও গুরু নানক ‘জয় নিরঙ্কার’ বলে কীভাবে হাত দিয়ে সেটা থামিয়ে দেন। শুনতে-শুনতে ছোটোবোন মাকে বাধা দিল, ‘কিন্তু একটা মানুষ কীভাবে পাথরের এত বড়ো একটা চাঙড় থামাবে?’ অমনি আমি বলে উঠি, ‘ঝড়ের বেগে ছুটে আসা ট্রেন থামানো গেল, পাথরের চাঁই থামানো যাবে না কেন?’ আমার চোখে জল। কোনো কিছুর পরোয়া না করে, জীবন তুচ্ছ করে ট্রেন থামিয়ে যারা খিদে তেষ্টায় কাতর দেশবাসীকে রুটিজল পৌঁছে দিয়েছিল, চোখের জলটা তাদের জন্য।

ভাষান্তর : অনিন্দ্য সৌরভ

পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ

আমার বাংলা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) : জন্ম নদিয়ার কৃয়নগরে। অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহির নওগাঁয় যাওয়ার আগে পর্যন্ত সুভাষের শৈশব কেটেছিল কলকাতায়, ৫০ নম্বর নেবুতলার গলিতে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আবার কলকাতায় ফিরে মেজোকাকার বাসায়, বাঞ্ছারাম অক্রূর লেনে আশ্রয় নিলেন। ভরতি হলেন ক্লাস ফাইভে। মেট্রোপলিটন স্কুলে, বউবাজার শাখায়।

বিশ শতকের তিনের দশকে দুনিয়া জুড়ে দেখা দিয়েছিল ভয়ংকর অর্থনৈতিক সংকট। তার ঝাপটা লাগে তাঁদের পরিবারেও। বউবাজার থেকে তাদের উঠে আসতে হয় দক্ষিণের শহরতলিতে। সুভাষকে ভরতি হতে হয় সত্যভামা ইন্সটিটিউশনে, সপ্তম শ্রেণিতে। এরপর নবম শ্রেণিতে ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আশুতোষ কলেজে ও স্কটিশচার্চ কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেন। পরে দর্শন নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ-তে ভরতি হলেও তুমুল রাজনৈতিক ব্যস্ততায় সুভাষের এম এ পরীক্ষা আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

সত্যভামা ইনস্টিটিউশনের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালীন স্কুল-ম্যাগাজিন *ফল্গু*-তে ছাপা 'কথিকা'-ই, তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। সুভাষের কবিসত্তার প্রকৃত বিকাশ ঘটে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায়। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে 'কবিতাভবন' থেকে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয়।

১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয় সুভাষের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিকোণ'। ১৯৫০-এ বেরোয় 'চিরকূট'। 'হাংরাস' তাঁর প্রথম উপন্যাস, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। পাঁচ ও ছয়ের দশকে একের পর এক প্রকাশিত হয় নাজিম হিকমতের কবিতার বাংলা অনুবাদ, অনূদিত উপন্যাস *কত ক্ষুধা; রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ; অক্ষরে অক্ষরে; কথার কথা; দেশবিদেশের রূপকথা; ছোটোদের জন্য সংক্ষেপিত বাঙালির ইতিহাস; ভূতের ব্যাগার; যত দূরেই যাই; কাল মধুমাস; যখন যেখানে; ডাকবাংলার ডায়েরি; নারদের ডায়ারি ; যেতে যেতে দেখা; বুশ গল্প সঞ্চয়ন।* সর্বোপরি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ – তিন বছর সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যৌথভাবে ছোটোদের বিখ্যাত সন্দেশ পত্রিকার নবপর্যায়ের সম্পাদনাও। ১৯৬৪-তে তিনি 'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। ছয়ের দশক থেকেই তিনি সংযুক্ত থাকেন 'আফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর বিভিন্ন রকম কাজে। এই সূত্রে পরিচিত হন বিশ্বের খ্যাতনামা কবি ও লেখকদের সঙ্গে। ১৯৭৭-এ অ্যাফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের 'লোটাস' পুরস্কারে সম্মানিত হন। সাতের দশকে *এই ভাই; ছেলে গেছে বনে; একটু পা চালিয়ে ভাই* কাব্য-গ্রন্থ ছাড়াও প্রকাশিত হয় স্মরণীয় উপন্যাস *হ্যাংরাস; কে কোথায় যায়।* পরের দুই দশকে উল্লেখযোগ্য বই-এর মধ্যে রয়েছে, *ধর্মের কল; ফুল ফুটুক; পাবলো নেরুদার আরও কবিতা; হাফিজের কবিতা; অমুর শতক; গাথা সপ্তশতী অনুবাদ কাব্য, অন্তরীপ বা হানসনের অসুখ; কাঁচা-পাকা; কমরেড; কথা কও উপন্যাস; আবার ডাকবাংলার ডাকে; ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন; ঢোলগোবিন্দর মনে ছিল এই; টানাপোড়েনের মাঝখানে; কবিতার বোঝাপড়া* প্রবন্ধগ্রন্থ। ছোটোদের জন্য তাঁর ছড়ার বই *'মিঁউয়ের জন্য ছড়ানো ছিটনো'*।

পরবর্তীকালের কাব্যগ্রন্থগুলি হলো 'যা রে কাগজের নৌকা'; 'ধর্মের কল'; 'ছড়ানো ঘুঁটি' প্রভৃতি। ১৯৮৮ সালে তিনি 'কবির পুরস্কার' লাভ করেন।

কাশ্মীরের ছেলে

জলিমোহন কল-কে

সূ চি প ত্র

	ভূমিকা	৭৩
*	গারো পাহাড়ের নীচে	৭৪
*	ছাতির বদলে হাতি	৭৭
	দীপঙ্করের দেশে	৮০
	বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ	৭৮
	শাল-মহুয়ার ছায়ায়	৯২
	পাতালপুরীর রাজ্যে	১০০
*	কলের কলকাতা	১০৫
	জগদ্দল পাথর	১১৮
	চাঁটগাঁয়ের কবিওয়ালা	১২৩
*	মেঘের গায়ে জেলখানা	১২৯
*	হাত বাড়াও	১৩৬

ভূমিকা

বেশ ছিল।

শেয়ালদায় যাও। টিকিট কাটো। তারপর বেরিয়ে পড়ো উত্তরে কি পুবে—যখন যেখানে মন চায়। ভেড়ামারা পার হয়ে সাড়ার পুল। নীচে তাকিয়ে মনে হবে পদ্মার ঢেউগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে গিলতে আসছে। কিংবা যাও গোয়ালন্দে। ভাজা ইলিশের গন্ধ স্টিমারঘাট অব্দি পেছনে ডাকতে ডাকতে যাবে।

আজ জলেস্থলে গণ্ডি আঁকা। সে গণ্ডি পার হবার হুকুম নেই।

দিন বদলেছে।

শালগাছের ছায়ায় ছায়ায় আজ আর গোরা পল্টনের তাঁবু নেই। খালের দুপাশে চিক চিক করে না মানুষের হাড়। লরির রাস্তায় এখন পত্তন হচ্ছে নতুন নতুন গঞ্জ। স্বাধীন দেশে মানুষ এখন নতুন করে দল বাঁধছে, নতুন করে শপথ নিচ্ছে, নতুন করে স্বপ্ন দেখছে সুখশান্তির।

শীতের হাওয়া দিলে আজও দাফা-র কথা মনে পড়ে। মাটির ঘরে কাঁথা গায়ে দিয়ে কাঁপছি। কপাটহীন জানালা-দরজা দিয়ে দেখছি জ্যোৎস্না গায়ে মেখে দূরে দাঁড়িয়ে আছে গারো পাহাড়। আমি তক্তাপোষে আর দাফা মেঝেতে। ঠান্ডায় দুজনেরই চোখে ঘুম নেই।

তিন কুলে কেউ ছিল না তার। কোথায় ছিল তার ঘরবাড়ি, কে ছিল তার মা-বাবা—কিছুই জানে না দাফা। ছেলেবেলায় সে ছিল গোরুচোর। সারা গায়ে তার মারের দাগ। দাফা বদলে গেল ললিতের বাড়িতে এসে। ললিতই তাকে রাস্তা থেকে ধরে এনেছিল। দাফাকে দেওয়া হলো গোরুর রাখালি। ললিতের বউকে দাফা মা বলে ডাকল। দাফা হয়ে গেল ললিতের ছেলের মতো। দাফাকে সবাই হাবাগোবা বলেই জানত। সেই দাফা পড়তে শিখল। সমিতির ঝান্ডা নিয়ে প্রচারে যাওয়া, হাটে হ্যান্ডবিল বিলি করা, চোঙা ফোঁকা—সব কাজেই দাফা-র ডাক পড়ে।

তার খুব ইচ্ছে একবার শহরে যাওয়ার। রেলগাড়ি কখনও সে দেখেনি। শহরে নাকি খুব আলো?

কলকাতায় ফিরে এলাম। তারপর কটা বছর কাটাকাটি ভাগাভাগি—কী আতান্তরেই না কেটেছে।

হঠাৎ একদিন শুনলাম বুকে গুলি লেগে দাফা মারা গেছে। লড়েছিল খুব জোর। কিন্তু বন্দুকের সঙ্গে পারেনি। দাফা মরতে চায়নি, চেয়েছিল মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচতে।

‘শহরে নাকি খুব আলো?’—এখনও কানে বাজছে।

শুধু কি দাফা? শুধু কি সেই পাহাড়তলী? সারা বাংলাদেশই সেদিন এমনি ছিল।

সেই এক-যে ছিল বাংলাদেশে যা দেখেছি যা শুনেছি তাই নিয়ে ‘আমার বাংলা’। বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ‘রংমশালে’ জোর করে না লেখালে কোনোদিনই হয়তো এ বই লেখা হতো না। এ বই পড়ে লোকের ভালো লাগবে কে জানত?

০১.০৬.১৯৬১ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গারো পাহাড়ের নীচে

চৈত্র মাসে যদি কখনও মৈমনসিং যাও, রাত্তিরে উত্তর শিয়রে তাকাবে। দেখবে যেন একরাশ ধোঁয়াটে মেঘে কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ভয় পাবার কিছু নেই; আসলে ওটা মেঘ নয়, গারো পাহাড়।

গারো পাহাড়ে যারা থাকে, বছরের এই সময়টা তারা চাষবাস করে। তাদের হাল নেই, বলদ নেই– তাছাড়া পাহাড়ের ওপর তো শুধু গাছ আর পাথর। মাটি কোথায় যে চাষ করবে?

তবু তারা ফসল ফলায়—নইলে সারা বছর কী খেয়ে বাঁচবে? তাই বছরে এমনি সময় শুকনো ঝোপে ঝাড়ে তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। সে কি যে-সে আগুন? যেন রাবণের চিতা—জ্বলছে তো জ্বলছেই। বছরের এমনি সময় যেন বনজঙ্গলের গাছপালারাও ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে।

জঙ্গলে যখন আগুন লাগে তখন হয় মজা। বনের যত দুর্ধর্ষ জানোয়ার প্রাণ নিয়ে পালাই-পালাই করে। বাঘ-অজগর, হরিণ-শুয়োর যে যেদিকে পারে ছোটে। আর পাহাড়ি মেয়ে-পুরুষরা সেই সুযোগে মনের সুখে হরিণ আর শুয়োর মারে। তারপর সন্ধেবেলা শিকার সেরে গোল হয়ে ঘিরে নাচ আর গান।

এদিকে আস্তে আস্তে গোটা বন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাথরের ওপর পুরু হয়ে পড়ে কালো ছাইয়ের পলেস্তারা, তার ওপর বীজ ছড়াতে যা সময়। দেখতে দেখতে সেই পোড়া জমির ওপর সবুজ রং ধরে—মাথা চাড়া দেয় ধান, তামাক, আর কত ফসল।

আমরা এই লোকগুলোর এক কাছে থেকেও পর; শুধু জানি, উত্তর দিকের আকাশটা বছরের শেষে একবার দপ্ করে জ্বলে ওঠে—দূরের আশ্চর্য মানুষগুলো তারপর কখন যে মেঘের রঙে মিলিয়ে যায় তার খবর রাখি না।

কাছাকাছি গিয়েছিলাম একবার।

গারো পাহাড়ের ঠিক নীচেই সুসং পরগনা। রেললাইন থেকে অনেকটা দূরে। গাড়ি যাবার যে রাস্তা, সে-রাস্তায় যদি কখনও যাও কান্না পাবে। তার চেয়ে হেঁটে যেতে অনেক আরাম।

সুসং শহরের গা দিয়ে গেছে সোমেশ্বর নদী। শীতকালে দেখতে ভারি শান্তশিষ্ট—কোথাও কোথাও মনে হবে হেঁটেই পার হই। কিন্তু যেই জলে পা দিয়েছি, অমনি মনে হবে যেন পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্রোত তো নয়, যেন কুমিরের দাঁত। পাহাড়ি নদী সোমেশ্বরী—সর্বদা যেন রেগে টং হয়ে আছে!

তার চেয়ে ফেরি আছে, গোরু-ঘোড়া-মানুষ একসঙ্গে দিব্যি আরামে পার হও। হিন্দুস্থানি মাঝির মেজাজ যদি ভালো থাকে, তোমার কাছ থেকে দেশবিদেশের হালচাল জেনে নেবে। হয়তো গর্ব করে বলবে, তার যে বিহারি মনিব, বাংলার সব ফেরিঘাটেরই সে মালিক।

পাহাড়ের নীচে যারা থাকে, তারা আমাদেরই মতো হালবলদ নিয়ে চাষ-আবাদ করে। মুখচোখে তাদের পাহাড়ি ছাপ। হাজং-গারো-কোচ-বানাই-ডালু-মার্গান এমনি সব নানা ধরনের জাত। গারোদের আলাদা ভাষা; হাজং-ডালুদের ভাষা যদিও বাংলা, কিন্তু তাদের উচ্চারণ আমাদের কানে একটু অদ্ভুত ঠেকে। 'ত'-কে তারা 'ট' বলে, 'ট'-কে 'ত'; আবার 'ড'-কে তারা 'দ' বলে, 'দ'-কে 'ড'। প্রথম শুনলে ভারি হাসি পাবে। ভাবো তো, তোমার কাকার বয়সের একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক দুধকে ডুড বলছে, তামাককে টামাক।

এ-অঞ্চলের গারোদের ঘর দূর থেকে দেখলেই চেনা যায়। মাচা করে ঘর বাঁধা। মাচার ওপরে যেখানেই শোয়া, সেখানেই রান্নাবান্না সবকিছু। হাঁসমুরগিও এই উচ্চাসনেই থাকে। এটা হচ্ছে পাহাড়ি স্বভাব। বুনো জন্তুজানোয়ারের ভয়েই এই ব্যবস্থা।

এই অঞ্চলের হাজংরাই সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি। 'হাজং' কথার মানে নাকি 'পোকা'। তাদের মতে, পাহাড়তলীর এই অঞ্চলে হাজংরাই প্রথম আসে; আর তখন চাষবাসে তাদের জুড়ি নাকি আর কেউ ছিল না। পাহাড়ি গারোরা তাই তারিফ করে তাদের নাম দিয়েছে হাজং—অর্থাৎ চাষের পোকা।

ধানের ক্ষেত দেখলে কথাটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। একটু কষ্ট করে যদি পাহাড়ে না হোক একটা টিলার ওপরেও ওঠো—নীচের দিকে তাকালে দেখবে পৃথিবীটা সবুজ। যতদূর দেখা যায় শুধু ধান আর ধান— একটা সীমাহীন নীল সমুদ্র যেন আহ্লাদে হঠাৎ সবুজ হয়ে গেছে।

এত ফসল, এত প্রাচুর্য— তবু কিন্তু মানুষগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় জীবনে তাদের শান্তি নেই। একটা দুষ্টু শনি কোথাও কোন্ আনাচে যেন লুকিয়ে আছে। ধান কাটার সময় বাড়ির মেয়ে-পুরুষ সবাই কাস্তে নিয়ে মাঠে ছুটবে; পিঠে আঁটি-বাঁধা ধান নিয়ে ছোটো ছোটো ছেলের দল কুঁজো হয়ে খামারে জুটবে। কিন্তু মাঠ থেকে যা তোলে, তার সবটা ঘরে থাকে না। পাওনাগন্ডা আদায় করতে আসে জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ। সে এক মজার ধাঁধা তখন তারা গালে হাত দিয়ে যেন বলে:

বড়োই ধাঁধায় পড়েছি, মিতে—
ছেলেবেলা থেকে রয়েছি গ্রামে;
বারবার ধান বুনে জমিতে
মনে ভাবি বাঁচা যাবে আরামে।
মাঠ ভরে যেই পাকা ফসলে
সুখে ধরি গান ছেলেবুড়োতে।
একদা কাস্তে নিই সকলে।
লাঠির আগায় পাড়া জুড়োতে
তারপর পালে আসে পেয়াদা
খালি পেটে তাই লাগছে ধাঁধা।।

গাঁয়ের আল-বাঁধা রাস্তায় লোহার-খুর-লাগানো নাগরায় শব্দ হয় খট খটাখট—দূর থেকে বাঁশের মোটা লাঠির ডগা দেখা যায়। ছোটো ছোটো ছেলের দল ভয়ে মায়ের আঁচল চেপে ধরে। খিটখিটে বুড়িরা শাপমুন্নি দিতে থাকে। জমিদারকে টঙ্ক দিতে গিয়ে চাষিরা ফকির হয়।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এ-অঞ্চলে জমিদারের একটা আইন ছিল—তাকে বলা হতো হাতিবেগার। জমিদারের বেজায় শখ হাতি ধরার। তার জন্য পাহাড়ে বাঁধা হবে মাচা। মাচার ওপর সেপাইসান্ত্রী নিয়ে নিরিবিলিতে বসবেন জমিদার; সেই সঙ্গে পান থেকে চুন না খসে তার ঢালাও ব্যবস্থা। আর প্রত্যেক গাঁ থেকে প্রজাদের আসতে হবে নিজের নিজের চালচিঁড়ে বেঁধে। যে জঙ্গলে হাতি আছে, সেই জঙ্গল বেড় দিয়ে দাঁড়াতে হবে। ছেলে হোক বুড়ো হোক কারো মাপ নেই। যারা হাতি বেড় দিতে যেত, তাদের কাউকে সাপের মুখে, কাউকে বাঘের মুখে প্রাণ দিতে হতো।

মানুষ কতদিন এসব সহ্য করতে পারে? তাই প্রজারা বিদ্রাহী হয়ে উঠল। গোরাচাঁদ মাস্টার হলেন তাদের নেতা। চাকলায় চাকলায় বসল মিটিং, কামারশালায় তৈরি হতে লাগল মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্র। শেষ পর্যন্ত জমিদারের পল্টনের হাতে প্রজাদের হার হলো। কিন্তু হাতি-বেগার আর চলল না।

এখনও চৈতননগরে, হিঙুরকোণায় গেলে খগ মোড়ল, আমুতো মোড়লের বংশধরদের মুখে বিদ্রোহের গল্প শোনা যায়। থুরথুরে বুড়ো যারা, তারা দুখ্যু করে বলে, সেকালে সর্ষের ক্ষেতে আমরা লুকোচুরি খেলতাম; মাঠে এত ধান হতো যে কাকপক্ষীরও অরুচি ধরত। গোয়ালে থাকত ষাট-সত্তরটা গোরু; নর্দমায় দুধ ঢালাই হতো। আর এখন? এক ফোঁটা দুধের জন্যে পরের দুয়োরে হাত পাততে হয়।

একটা কথা আগে থেকে বলে রাখি। ও-অঞ্চলে যদি কখনও যাও, ওরা তোমাকে 'বাঙাল' বলবে। চটে যেয়ো না যেন। বাঙাল মানে বাঙালি। বাংলাদেশে থাকলেও ওদের আমরা আপন করে নিইনি—তাই ওরাও আমাদের পর-পর ভাবে।

অথচ আমরা সবাই বাংলাদেশেরই মানুষ।

ছাতির বদলে হাতি

নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক্ ডুমা ডুম ডুম। কিন্তু শুধু একটা ছাতির বদলে এক নয়, দুই নয় একবারে তিন বারোং ছত্রিশ বিঘে জমি—নাকের বদলে নরুন তো তার কাছে কিছুই নয়। বিশ্বাস না হয়, বেশ, একবার হালুয়াঘাট বন্দরে যেয়ো। সেখানে মনমোহন মহাজনের গদিতে গেলেই বুঝবে কী তেজ বন্ধকি-তেজারতির। মনমোহন মহাজন গত হয়েছেন অনেক দিন; কিন্তু সেই মহাজনের পন্থা আজও টিকে আছে।

পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা। হালুয়াঘাট বন্দরে গারো পাহাড়ের নীচের এক গাঁ থেকে সওদায় এসেছিল এক গারো চাষি। নাম তার চেংমান। এমন সময় দেও-দেবতা স্তম্ভিত, দিক- পৃথিবী কম্পিত করে মুষলধারে বৃষ্টি। সে বৃষ্টি ধরবার কোনো লক্ষণই নেই।

এদিকে দিন তো হেলে, রাত তো টলে—বাড়ি ফেরার উপায় কী? মনমোহন মহাজনের দোকানের ঝাঁপির নীচে চেংমান আশ্রয় নিয়েছিল।

হঠাৎ মহাজন যেন করুণার অবতার হয়ে উঠল। একেবারে খাস কলকাতা থেকে খরিদ-করে আনা আনকোরা নতুন একটা ছাতা চেংমানের মাথার ওপর মেলে দিয়ে মনমোহন বলল : 'যা যা, ছাতিটা নিয়ে বাড়ি চলে যা। নিজে ভিজিস তাতে কিছু নয়, কিন্তু এতগুলো পয়সার সওদা যে ভিজে পয়মাল হয়ে যাবে।'

মহাজনের দরদ হঠাৎ কীসে এত উতলে উঠল? চেংমান দোমনা হয়ে ভাবছে নেব কি নেব না। নিশ্চয় অনেক দাম। হাতে পয়সাও তো নেই।

‘নগদ পয়সা নাই বা দিলে। যখন তোমার সুবিধে হবে দিয়ে গেলেই হলো। ওর জন্যে কিছু ভেবো না।’—মনমোহন ভরসা দেয়।

চেংমান ভাবল এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। নতুন ছাতি মাথায় দিয়ে মহাফুর্তিতে বাড়ির দিকে সে চলল। ছেলে-পুলে-বউ তার পথ চেয়ে বসে আছে। চেংমান গেলে তবে হাঁড়ি চড়বে।

চেংমান ফি বার হাটে যায়। মনমোহনকে বলে, ‘বাবু, পাওনাগন্ডা মিটায়ে নেন।’ মনমোহন ফি বারই বলে, ‘আহা-হা অত তাড়া কীসের, সে দিও ক্ষণ পরে।’ এমনি করে বছর, তারপর বছর যায়। ধার করে ছাতি কেনার কথা চেংমান ভুলেই গেল। হঠাৎ একদিন হাটবারে মনমোহন চেংমানকে পাকড়াও করে। ‘—কী বাছাধন, বড়ো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ। পাওনা মিটিয়ে দিয়ে যাও।’ মনমোহনের কথায় চেংমানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। চেংমান বুঝতে পারে এবার সে ইঁদুরকলে পড়েছে।

মনমোহন তার লাল খেরোয় বাঁধানো জাবদা খাতা বার করে যা পাওনা হিসেব দেখাল, তাতে চেংমানের চোখ কপালে উঠল। এই ক-বছরে চক্রবৃদ্ধিহারে ছাতির দাম বাবদ সুদসমেত পাওনা হয়েছে হাজার খানেক টাকা। প্রায় একটা হাতির দাম।

বিশ্বাস করো, বানানো গল্প নয়। যদি যাও ও-অঞ্চলে, পাকাচুল প্রত্যেকটা ডালু-হাজং-গারো চাষি এর সাক্ষী দেবে।

ডালুদের গ্রাম কুমারগাঁতির নিবেদন সরকারের মুদিখানায় দু-দশ বছর বাকিতে মশলাপাতি কেনার জন্যে নিবেদনের ছেষট্টি বিঘে জমি মহাজন কুটিশ্বর সাহা এমনিভাবে দেনার দায়ে কেড়ে নিয়েছে। আরেক ধুরন্ধর মহাজন এক চাষিকে ধারে কোদাল দিয়ে পরে তার কাছ থেকে পনেরো বিঘে জমি মোচড় দিয়ে নিয়েছিল।

ও-অঞ্চলের পঞ্চাশটা গ্রামে ডালুদের বাস। কথাবার্তায় পোশাক-পরিচ্ছদে হাজংদের সঙ্গে এদের খুব বেশি মিল। কে ডালু, কে হাজং বোঝাই যায় না। কিন্তু ডালুদের জিজ্ঞেস করো, ওরা বলবে—হাজংরা জাতে ছোটো। হাজংরাও আবার ঠিক উলটো বলবে।

ডালুরা বলে, সে দিন আর নেই। আগে ছিল তারা অন্ধ বোকার জাত। পাহাড়ের নীচে যেদিন থেকে লাল নিশান খুঁটি গেড়েছে, সেই দিন থেকে তাদের চোখ ফুটেছে।

সে এক দিন ছিল বটে। শুধু মনমোহন মহাজন আর কুটিশ্বর সাহাই নয়— ছিল জোতদার আর তালুকদারদের নিরঙ্কুশ শাসন। আর সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সিংহের দাপট। সিংহ—যার ভালো নাম পশুরাজ।

জমিদারের খামারে জমির ধান তুলতে হবে। জমিদারের পাওনা মিটিয়ে তবে চাষি তার ঘরে ধান নিয়ে যেতে পারত। চুক্তির ধান তো বটেই, কার ওপর কর্জার ধান শোধ দিতে হতো টাকায় এক মণ হিসেবে। তাছাড়া আছে হাজার রকমের বাজে আবওয়াব। অর্থাৎ খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। যে চাষি বুকের রক্ত জল করে এত কষ্টে ফসল ফলাল শেষটায় তাকে শুধু পালা হাতে করে ঘরে ফিরতে হতো।

এদিকে আর এক রকমের প্রথা আছে—নানকার প্রথা। নানকার প্রজাদের জমিতে স্বত্ব ছিল না। জমির আমকাঁঠালে তাদের অধিকার ছিল না। জমি জরিপের পর আড়াই টাকা পর্যন্ত খাজনা সাব্যস্ত হতো। খাজনা দিতে না পারলে

তহশিলদার প্রজাদের কাছারিতে ধরে নিয়ে যেত, পিছমোড়া করে বেঁধে মারত; তারপর মালঘরে আটকে রাখত। নিলামে সব সম্পত্তি খাস করে নিত। মহাজনেরা কর্জা ধানে এক মণে দু-মণ সুদ আদায় করত।

কিন্তু নওয়াপাড়া আর দুমনাকুড়া, ঘোষপাড়া আর ভুবনকুড়ার বিরাট তল্লাটে ডালু চাষিরা আজ জেগে উঠেছে। তারা বলেছে, জমিদারের খামারে আমরা ধান তুলব না। ধান তারা তোলেনি। পুলিশ-কাছারি কিছুতেই কিছু হয়নি। শেষে জমিদার হার মেনেছে।

আজ তারা গর্ব করে বলে, বন্দরের ভদ্রলোকেরা আজ আর আমাদের তুই-তুকারি করতে সাহস পায় না। 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করে। থানায় চেয়ার ছেড়ে দেয় বসতে। আমরাও অনেক সভ্য হয়েছি। আগে বাপ-ছেলে একসঙ্গে বসে মদ খেত, এখন মদ খাওয়া সমাজের চোখে খুবই লজ্জার বিষয়।

হালবলদের অভাবে চাষ-আবাদের আজকাল বেজায় মুশকিল। এখানকার চাষিরা তাই সবাই মিলে গাঁতায় চাষ করে। চাষ করতে করতে ওরা ছেলেমেয়েরা মিলে গান ধরে :

শুনো শুনো বন্ধু গো ভায়া
রোয়া লাগাইতে চলোগো এলা।
বন্ধুর জমিখানি দাহাকোণা
হাল জরিছে মৈষমেনা
হাল বো আছে
নি' উথি মাতি রে
কত বা লাগাব নিতি নিতি,...

চলো বন্ধু! এখন রোয়া লাগাতে যাই। পাহাড়ের নীচে আমাদের জমি; হালের ভারে মোষের শিং নুয়ে পড়েছে। আমরা হাল বাইছি ভাই, আমরা হাল বাইছি। কিন্তু কঠিন মাটি উঠতে চায় না। কী কষ্ট! কী কষ্ট!

যারা এত কষ্ট করে আমাদের মুখে অন্ন জোগায়—ইচ্ছে করে, জমিদারের হাত থেকে বাংলার সমস্ত জমি তাদের হাতে দিই, মহাজনের নিষ্ঠুর ঋণের বোঝা থেকে তাদের মুক্তি দিই। তোমাদের কি ইচ্ছে হয় না?

দীপঙ্করের দেশে

সামনে বাবলা বনের ভেতর দিয়ে ধু ধু করছে নদী। নাম কীর্তিনাশা। সাদা বকের মতো পাল উড়িয়ে নৌকা ছুটছে সাঁই সাঁই। একতলা নীচু পাটের জমি গাঁয়ের রাস্তা থেকে গড়ান হয়ে নেমে গেছে হুই ঘাট-বরাবর। দু-বছর আগের কথা। চোখ বুঁজলে আজও যেন সব দেখতে পাই। আসবার দিন স্টিমার থেকে ঝাপসা দেখতে পাচ্ছি রানিনগরের এতিমখামা—রোদ্দুরে ঝিকমিক করছে ঢেউখেলানো করোগেটের টিন। দূরে পুতুলের মতো ক্ষুদে ক্ষুদে দেখা যাচ্ছে।—কে আলি হোসেন না গৌরাঙ্গ? মজিদ না রাধাশ্যাম?

গিয়েছিলাম ঢাকার বিক্রমপুর পরগনায়। এই বিরাট পরগনাকে বলে মুনশিগঞ্জ মহকুমা। বিক্রমপুরের মাটিতে মিশে আছে অনেক দিনের ইতিহাস। এখানকার প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপে পাওয়া গেছে বহুকালের বিস্মৃত শিলালিপি। পুরোনো দিনের ইতিহাসের সাক্ষী অনেক সায়র, অনেক বিল আজ বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে। যাঁর পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় দূর নেপাল থেকে সুদূরে শ্যামসুমাত্রা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিল, সেই স্বনামধন্য দীপঙ্করের জন্মভূমি এই বিক্রমপুর।

...স্টিমার এসে থামল তারপাশায়। জেটি থেকে ডাঙা অনেকটা তফাতে। মাঝখানে সরু সরু তক্তা জোড়া দেওয়া লম্বা নড়বড়ে পুল। মোটঘাট মাথায় নিয়ে পার হবার সময় মনে হয় বৈতরণী পার হচ্ছি। একরাশ লোকের ভারে পুল ভাঙো-ভাঙো হয়, নীচের দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে। কালো কালো ঢেউগুলো সব মুখে ফেনা তুলে গজরাচ্ছে। কুমিরের মতো হাঁ করে আছে, জিভ দিয়ে যেন তাদের জল গড়াচ্ছে। সরু

নড়বড়ে পুলের ওপরকার মানুষগুলোর পিছু নিতে নিতে তারা যেন বিড় বিড় করে বলছে—ফসকালেই হয়! ফসকালেই হয়!

টলতে টলতে পড়ি কি মরি করতে করতে কোনোরকমে তো প্রাণ নিয়ে ডাঙায় এসে উঠলাম। উঠেছি কী অমনি সপাং সপাং চাবুকের মতো এক ঝলক বালি এসে চোখমুখ কানা করে দিল। সারাদিন ঠায় রোদ্দুরে পুড়ে মেজাজ তাদের তিরিক্ষি হয়ে আছে। যেখানে লাগে ফোসকা পড়িয়ে দেয়।

নদীর পাড়ে গোটাকয়েক চা-জলখাবারের দোকান। চারিদিকে আর জনমনিষ্যি নেই। চায়ের গেলাসে গলা পর্যন্ত থিক থিক করছে বালি। দোকানের চালাগুলো নতুন। ঘাট ছিল আগে আরও ওপাশে, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। নদী ভাঙতে ভাঙতে চলেছে; সামনেই নদীর ঠিক বুকের ওপর অস্পষ্ট নতুন চর জেগে উঠেছে।

যাব মেদিনীমণ্ডল। উত্তরে অনেকটা রাস্তা। যতদূর নজর যায় লোক চোখে পড়ে না। গ্রামগুলো খাঁ খাঁ করছে।

আকালের বছরে সব শেষ হয়ে গেছে। কামারবাড়িতে গ্রামের দু-একজন বুড়ো লোকের সঙ্গে দেখা হয়। পোড়াকাঠের মতো চেহারা—সারা গায়ে দগদগ করছে খোসপাঁচড়া।

বিপিন কর্মকার দুঃখের কাহিনি বলতে হাপুস নয়নে কাঁদে। ঘরের যথাসর্বস্ব বেচে দিয়েও ডাগর ছেলেটাকে সে বাঁচাতে পারেনি। হাতুড়ি, নেহাই জলের দরে বিক্রি করে দিয়েছে বন্দরের মহাজনের কাছে। শুধু হাপরটা আজও পারেনি—তাতে লোহা না পুড়ুক, কল্কের আগুন ধরানো চলে। গাঁয়ের পুরুতঠাকুরও কান্নাকাটি করে; সব গিয়ে শুধু পৈতেগাছটা আছে। বারো মাসের তেরো পার্বণের দিন আর নেই। যতদিন গাঁয়ে বসন্ত আছে, শীতলা মার পুজো চলবে। কিন্তু তাও আবার উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। চারগন্ডা পয়সাও দক্ষিণা পাওয়া যায় না। ঠাকুর মশাই দুখ্যু করে বলে, বামুন হয়ে জন্মেছি; না করতে পারি চাষের কাজ, না করতে পারি কুলিগিরি। আমাদের সব দিক দিয়েই মরণ।

গাঁয়ের অর্ধেক লোক দেশত্যাগী হয়েছে। কে কোথায় গেছে কেউ জানে না। যারা এখনও মাটি কামড়ে পড়ে আছে, তারাও যাব যাব করছে। ঘরে মানুষ হয় জ্বরে কাতরাচ্ছে, না হয় তো খালি কোলে মেয়েরা ডুকরে কাঁদছে। মুসলমানপাড়ায় ঢুকলে দেখা যায় বাড়ির উঠোনগুলো উঁচু ঢিবি হয়ে আছে। যারা মরেছে তাদের দূরে নিয়ে গিয়ে কবর দেবারও সামর্থ্য ছিল না যে কারও।

জেলেপাড়া, যুগিপাড়া সাফ হয়ে গেছে। গাঁয়ের রাস্তায় হাঁটতে গা ছমছম করে। বাড়িতে বাড়িতে আর সন্ধে জ্বলে না, শাঁখও বাজে না। রাত্তিরে ঝড় উঠলে হারিকেন হাতে ছেলের দল আমবাগানে আর ছুটে যায় না। পাকা আম মাটিতে পড়ে পচে যাচ্ছে। বাপের জন্মে কেউ এমন দেখেনি।

ঋষিপাড়ায় আর ডুগ ডুগ বাজনা বাজে না। ভাগাড়ে গোরু পড়ে না—চামড়া পাবে কোত্থেকে? হালবলদ বেচে দিয়ে চাষিরা বিশ টাকায় দশ সের চালও ঘরে আনতে পারেনি।

সব গাঁয়ের সব লোকের এক দশা। তেমনি আবার গাঁয়ের দু-চার জন লোক এই দুর্ভিক্ষে তাদের ভোল ফিরিয়েছে। যেমন আমতলার মৈজুদ্দি ব্যাপারী। টঙ্গিবাড়ি বাজারে ছিল তার ভুষিমালের দোকান। চালের কারবার করে দুদিনে সে ফেঁপে উঠল। দারোগা-পুলিশকে ঘুষ দিয়ে বাইরে থেকে বস্তা বস্তা চাল এনে মৈজুদ্দি মজুত করেছিল। ভাতের অভাবে লোক যখন বাজারের রাস্তায় এসে মাছির মতো মরছিল, তখন মৈজুদ্দি সেই চাল বেচেছে আশি টাকা মন দরে। গাঁয়ের লোক জলের দামে জমি বেচেছে, সেই জমি কিনে মৈজুদ্দি হয়েছে হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক। মৈজুদ্দির টিনের চালা ভেঙে পাকা দালানকোঠা উঠেছে।

লৌহজঙ্গ বন্দরের ব্যাপারীরা ভারী মুশকিলে পড়েছিল। দিঘলীর খাল যেখানটায় পদ্মায় গিয়ে পড়েছে, তারই মুখে দোকানপাট, গুদাম আর মহাজনদের গদি। যত লোক না খেয়ে রোগে হাত-পা ফুলে মরেছে, তাদের টেনে টেনে খালের জলে ফেলা হয়েছে। এদিকে স্তূপাকার শবদেহে খালের মুখ পর্যন্ত বুঁজে গিয়েছে। দুর্গন্ধে বন্দরে টেকা দায়। বন্দরের মহাজনরা মহা ফাঁপড়ে পড়ল। এ যেন লোকগুলো মরে গিয়ে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। শেষপর্যন্ত বাইরে থেকে মাইনে-করা ডোম আনতে হলো খাল থেকে মড়া ফেলার জন্যে। মহাজনদের গাঁটের কড়ি বেশ কিছু খরচ করতে হলো। কিন্তু মানুষ মেরে যা লাভ তারা করেছে তার তুলনায় তা কিছুই নয়। মানুষ মেরে তারা লাভ করেছে মাথাপিছু হাজার টাকা, আর প্রত্যেকটা মড়া ফেলার জন্য তাদের খরচ হয়েছে আট আনা কি এক টাকা।

তাছাড়াও আকালের মরশুমে কত রকমের ভেক, কত রকমের বুজরুকির সৃষ্টি হয়েছে। হাঁসাইলের বিক্রমাদিত্য পর্বত। নাম শুনলে হাসি পায়। লোকটা ছিল হোমিওপ্যাথির ডাক্তার। গাঁয়ে যখন মড়ক লাগল, হঠাৎ দেখা গেল সে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী সেজে গাছতলায় বসেছে। লোকজনকে দিচ্ছে স্বপ্নাদ্য ওষুধ। ওষুধ না ছাই! কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল রোগাপটকা লোকটার গায়ে মাংস লেগেছে। যখন মড়ক থেমে গেল, তখন দেখা গেল পর্বত আবার পুনর্মূষিক হয়েছে, গেড়ুয়া ছেড়ে হোমিওপ্যাথি ধরেছে।

রানিনগর গ্রামে পৌঁছুতেই দু-একবার একবার বিদ্যুত চমকিয়ে আকাশ একেবারে ভেঙে পড়ল। সামনে টিনের একটা আটচালা। লেখা রয়েছে : রানিনগর এতিমখানা। যাঁর ওপর এতিমখানা চালানোর ভার তিনি সমাদর করে ঘরে বসালেন। ভদ্রলোকের নাম আবদুর রহমান। লোকে বলে, রহমান মাস্টার। লেখাপড়া ইংরিজি-বাংলা ভালোই জানেন।

গ্রামের প্রাইমারি ইস্কুলে আর পোস্টাপিসে দু-জায়গাতেই এক সঙ্গে তিনি মাস্টারি করতেন। সেই থেকে সবাই তাঁকে রহমান মাস্টার বলে ডাকে। মুখে সর্বদা একটা মিষ্টি হাসি লেগে আছে।

রহমান মাস্টারের কাছে শুনলাম, ও-অঞ্চলের দুর্দশার কথা। বিক্রমপুরের অধিকাংশ লোকই থাকে বাইরে বাইরে। চাকরি করে, ব্যাবসা করে আর মনি অর্ডারে বাড়িকে টাকা পাঠায়। এত মনি অর্ডার আর কোনো দেশে আসে না। তবু চিরকাল বিক্রমপুরের নাম ছিল, সমৃদ্ধি ছিল। ছুটির সময় গ্রামগুলো লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠত। আজ ফুটবল, কাল নৌকা-বাইচ– খুব আনন্দে দিন কাটত। দু-তিন মাস জলে জলে কাটিয়ে জেলেরা ফিরত ঘরে। দেশবিদেশের গল্পে জমে উঠত আসর। দুর্ভিক্ষ এসে সব চুরমার করে দিয়েছে। চালের দাম উঠেছে চল্লিশ থেকে আশি টাকায়। নাতিপুতি-বউ নিয়ে বিধবা মা রাস্তার দিকে হাপিত্যেশে চেয়ে আছেন কবে মনি অর্ডারে ছেলের কাছ থেকে টাকা আসবে। শেষ পর্যন্ত পিওন এল–কিন্তু টাকা নিয়ে নয়, ছেলের মৃত্যু খবর নিয়ে। এমনি করে শেষ হয়ে গেছে কত সংসার। সব কিছু গিয়ে শুধু ভিটেমাটিতে এসে ঠেকেছে।

নতুন লোক দেখে এতিমখানার ছেলেমেয়েরা পড়ার বই রেখে দিয়ে ছুটে আসে। আলি হোসেন, গৌরাঙ্গ, আজিমুন্নেসা, সুকুরবানু, হরিদাসী, মজিদ, রাধাশ্যাম– একে একে আলাপ হয়। দুর্ভিক্ষে বাপ-মা মরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক সৃষ্টিছাড়া সংসার গড়ে উঠেছে। সকলের বড়ো আলি হোসেন। বড়ো ভাইয়ের মতো সকলকে সে আগলায়।

আলি হোসেনের বাড়ি ত্রিপুরায়। চাঁদপুরে স্টিমারে উঠে ভিক্ষে করছিল। স্টিমার ছেড়ে দেওয়ায় আর নামতে পারেনি। একেবারে নেমেছিল তারপাশায়। সেখানে থেকে গিয়েছিল মাওয়ার বাজারে। বাজারের লঙ্গরখানায়

একবেলা খিচুড়ি খেত আর রাত্তিরে পড়ে থাকত দোকানের দাওয়ায়। রাত্তিরে ঘুম হতো না ঠান্ডায়। গায়ের চামড়া ফেটে রক্ত বেরোত। তার ওপর মাছি বসে বসে দগদগে ঘা হয়ে গিয়েছিল। আলি হোসেনকে তাই বাজারের লোকজন পাঠিয়েছিল রিলিফ হাসপাতালে। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে রানিনগরের এতিমখানায়। বাপ-মার কথা জিজ্ঞেস করলে দশ বছরের ছেলে আলি হোসেনের চোখগুলো ছোটো ছোটো হয়ে আসে; আর বোধহয় কান্না চাপার জন্যেই তিন বছরের ছোট্ট বোন হরিদাসীকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে। আলি হোসেনের বাপ-মা ভাইবোন নিজের বলতে কেউই নেই।

ছোটো হলে কী হয়, বাপ-মার কথা গৌরাঙ্গর মনে আছে। গৌরাঙ্গদের বাড়ি পাবনা জেলায়। বাপ তার ঘরামির কাজ করত। এরবার উঁচু চালের মটকা বাঁধতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গিয়েছিল গৌরাঙ্গর বাবা। তবু খোঁড়া পা নিয়েই আবার কাজে লেগেছিল। কিন্তু গাঁয়ে আর কাজ পাওয়া গেল না। তারপর চালের দাম হলো চল্লিশ টাকা। নস্কররা গাঁয়ের বড়ো জোতদার। তাদের পা ধরে গৌরাঙ্গর বাবা কত কাঁদাকাটা করল—দু-সের ধানও তারা কর্জ দিল না। তারপর থালা-বাটি সব বিক্রি করেও যখন আর বাঁচা গেল না, তখন গৌরাঙ্গর বাবা গলায় দড়ি দিয়ে মরল। গৌরাঙ্গর ছোটো বোনটাও দুদিন পরে মারা গেল। গৌরাঙ্গর মা কদিন খুব বুক চাপড়ে কাঁদাকাটা করল, তরপর কোথায় যে চলে গেল গৌরাঙ্গ আর খুঁজে পেল না। সিরাজগঞ্জের ঘাটে গৌরাঙ্গ ভিক্ষে করছিল, তাই দেখে এক ভদ্রলোক তাকে নিয়ে আসে মাওয়ার বাজারে।

আজিমুন্নেসা আর সুকুরবানু দই বোন। বড়ো আজিমুন্নেসার মুখে আগুনে পোড়া দাগ। আগুনে পোড়ার কথা বললে এখনও আজিমুন্নেসার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আজিমুন্নেসার বাপ সলিমুল্লা ছিল কুমারভোগের তাঁতি। অভাবে তাঁত বেচতে হলো সলিমুল্লাকে। শেষ পর্যন্ত শোথ হয়ে সলিমুল্লা মারা গেল। আজিমুন্নেসার মা নিরুপায় হয়ে আবার বিয়ে করল—কিন্তু নতুন সংসারে মেয়ে দুটির আর ঠাঁই হলো না। আজিমুন্নেসা আর সুকুরবানুর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় দয়া করে তাদের আশ্রয় দিল। কিন্তু অভাব কার সংসারে নেই। তাদের এমন হলো যে আর দিন চলে না। মনুষ্যত্ব পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। একদিন আজিমুন্নেসাকে ক্ষিধেয় কাঁদতে দেখে বাড়ির কর্তা মেয়েটার মুখ উনুনের মুখে চেপে ধরল। মন গুলো সব পাষাণ হয়ে গেছে। শেষকালে সুকুরবানুর চিৎকারে পাড়ার লোক ছুটে এসে আজিমুন্নেসাকে বাঁচাল।

এতিমখানার ছোটো ঘরটার মধ্যে এমনি দুঃখের কাহিনি যেন জমাট বেঁধে আছে।

মজিদকে জিজ্ঞেস করলাম, বড়ো হয়ে তুমি কী করবে? মজিদের চোখ হঠাৎ জ্বলে ওঠে; হাতের মুঠোটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে বলে, বড়োলোকদের শেষ করব।

—কথাটা বোধহয় রহমান মাস্টারের শেখানো।

রানিনগরের এতিমখানা থেকে বেরিয়ে পড়লাম রাত ফরসা হবার আগেই। আলি হোসেন আর গৌরাঙ্গ, মজিদ আর রাধাশ্যাম, আমিনা আর হরিদাসী সকালে ঘুম ভেঙে উঠেই আমাকে খুঁজবে জানি। ঘণ্টা কয়েকের মাত্র আলাপ। তারই মধ্যে ওরা আমাকে আপন করে নিয়েছে।

কিন্তু ওদের ঘুম থেকে তুলে বিদায় নেব, সে সাহসও নেই। যাচ্ছি শুনলে সুকুরবানু যদি কাঁদে? বলা যায় না, যদি আমার চোখই ঝাপসা হয়ে ওঠে?—তাই বিদায় না নিয়েই বোঁচকাবুচকি কাঁধে ফেলে রওনা হই। হাত ধরে

বাঁশের সরু সাঁকোটা পার করে দিলেন রহমান মাস্টার। তারপর মুঠো করা হাত ওপরের দিকে তুলে কী একটা কথা বলতে চাইলেন। ঠোঁট দুটো ফাঁক হতে দেখলাম, কিন্তু কোনো আওয়াজ বেরোল না। হঠাৎ পেছন ফিরে রানিনগরের রাস্তা-বরাবর মাটিতে চোখ রেখে হন হন করে হাঁটতে লাগলেন রহমান মাস্টার। খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়ালাম।—বিচিত্র এই পৃথিবী, বিচিত্র মানুষের ভালোবাসা।

আবার পথ-চলা শুরু হয়। ঘোড়দৌড়ের বাজার পেরিয়ে লৌহজঙ্গ। মুনশিগঞ্জ ঘাট থেকে সোনারং আর টঙ্গিবাড়ি, কমলাঘাট আর বজ্রযোগিনী।

রাস্তার দুপাশের গাছে অজস্র পাকা গাব। পাতা দেখা যাচ্ছে না গাছের।

ঘাট থেকে ফিরছিল এক বুড়ো। হঠাৎ সে গাছগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, দেখেছেন?—একটু অবাক হয়ে গেলাম। লোকটার প্রশ্ন শুনে নয়, প্রশ্নের সঙ্গে তাকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে দেখে। বেশ তো লাল টুকটুকে ফল ধরেছে গাছে। তাতে মন খারাপ করবার কী আছে?

আছে। কেননা এ-দৃশ্য নাকি এ-অঞ্চলে তিন কালে কেউ দেখেনি। বর্ষার মরশুম শুরু হয় হয়। নৌকো মেরামতের এই হচ্ছে সময়। অন্য অন্য বার এক ঢের আগেই নৌকো সারানোর ধুম পড়ে যায়। এ-সময় গাছে গাব পাকতে পারে না। কারণ গাবের আঠা দিয়ে না জুড়লে নৌকো মেরামতই হয় না। কিন্তু গাব রইল গাছে। নৌকো সারাবে কীসে?

বুড়ো বলে, আজ কারো নৌকোই নেই, তার আবার সারাবে। জ্বালানির অভাবে নৌকোর কাঠ সব চেলা করে লোকে মড়া পুড়িয়েছে। আর আজ তারা আসমানে মেঘের চিড়িক দেখে আর কপাল চাপড়ায়। কী করে তারা এ-বর্ষা কাটাবে? দু-দিন পরেই জলে থইথই করবে গোটা তল্লাট। নৌকো না হলে হাটেবাজারে যাওয়া দূরের কথা, পাড়াপড়শির বাড়িতে যে একটু দুঃখের গল্প বলতে যাবে, সে উপায়ও থাকবে না।

বুড়ো যে-গাঁয়ে থাকে, নাম তার নেত্রাবতী। গাঁয়ের রাস্তায় চলতে চলতে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, শুনতে পাচ্ছেন? কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলাম। একটা ঝিঁঝি অনেকক্ষণ ধরে ডেকে চলেছে। মাথা খারাপ নাকি বুড়োটার? পাগলের পাল্লায় পড়ে শেষটায় বেঘোরে মারা পড়ব নাকি?

এতক্ষণ ভালো করে তাকাইনি। বসন্তে পোড়-খাওয়া ঘা-দগদগে বীভৎস মুখ বুড়োটার। মাথার চুল সব উঠে গেছে। ফাঁকা ফাঁকা দুটো চোখ কোটরের মধ্যে ঢোকানো। এমনভাবে তাকিয়ে থাকে, চোখের পাতা পড়ে কি পড়ে না বোঝা যায় না।

একটা পা মাটিতে আছড়িয়ে বুড়ো বলে, এই মাটি কাঁপত আগে হাতুড়ি আর নেহাইয়ের গমগম আওয়াজে। মিস্ত্রিপাড়ায় ঢুকতে আজ গা ছম ছম করে। পোড়ো ভিটেগুলোর ওপর দিনদুপুরে শেয়াল ডাকে।

বুড়ো আমাকে ভেবেছিল রিলিফের লোক। একটু পরে ভুল যখন তার ভেঙে গেল, তখন একটু গরম হয়েই বলল—এসেছেন কেন এই পোড়া দেশে? মানুষ মরে ফৌত হয়ে গেছে তাই দেখতে?

আমার তখন এমন অবস্থা, পালাতে পারলে বাঁচি। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা এই বুড়োকে কী করে আমি বোঝাই যে, কঙ্কালের ছবি এঁকে আমি বাঁচা আর আধ-বাঁচা মানুষগুলোকে জাগাব? দানছত্রের খুদকুঁড়ো নিয়ে আসিনি আমি। আমি এসেছি পাথরে পাথরে চকমকি ঠুকে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালাতে। কেমন করে বলি?

ডান পাশে কচা গাছের ঝোপের ভেতর দিয়ে একটা অজানা গাঁয়ের রাস্তা। সেদিকে পা বাড়াতেই বুড়ো হাঁ হাঁ করে উঠল—ও-গাঁয়ে যাবেন না।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। আচ্ছা লোক তো? জমিদারি নাকি ওর যে, বারণ করবে?

চটেছি বুঝতে পেরে বুড়ো নিজের থেকেই বলল—দেখুন ও-গাঁয়ে মেয়েদের পরবার কিছুই নেই। খাটতে তো হয়। তাই দিনের বেলায় ঘরেও বসে থাকতে পারে না। আপনি গেলে ওরা ভারি লজ্জা পাবে।

শুনে থ' হয়ে গেলাম। কোন দেশে আছি আমরা? কোন শতাব্দী এটা? চিন্তার মধ্যে সবকিছু যেন এলোমেলো হয়ে গেল।

কাটা একটা আঙুল শুধু চোখের ওপর ভেসে উঠল—যে-আঙুল কেটে নিয়েছে ইংরেজ বেনের দল। যে-আঙুলে বোনা হতো একদিন দুনিয়া-জয়-করা ঢাকাই মসলিন, সেই কাটা আঙুলের রক্ত আজও বন্ধ হয়নি। চোখ বুঁজে সূর্যের দিকে তাকালাম, সেই রক্ত। আজও ঝোপটার দিকে তাকিয়ে দেখি গাছের ডালে থমকে আছে ফোঁটা ফোঁটা সেই রক্ত! দ্রৌপদীর বস্ত্র কেড়েছে যে দুঃশাসন, তার রক্ত কবে ফিনকি দিয়ে বেরোবে?

আমতলীর বাজারে আসতে সন্ধে হয়ে গেল।

বাজারের পাশ দিয়ে গেছে খাল-বরাবর রাস্তা। অমাবস্যা কিনা জানি না। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। সেই অন্ধকারে একদল ছায়ামূর্তি মাথায় করে মোট বয়ে তুলে দিচ্ছে খালের নৌকোয়।

বাজারের এক ফড়ে যাচ্ছিল আমাকে সোনারঙের রাস্তা দেখাতে। সে বলল, দেখলেন ব্যাপারখানা?

পরে সে যা বলল তাতে দেখলাম অবাক হবার কিছু নেই। সেন আর গুপ্ত, দত্ত আর মিত্তির বাড়ির মেয়েরা অন্ধকারে বেরিয়েছে মাথায় করে মোট বইতে। পেটে আগুন জ্বললেও দিনের বেলায় তাদের বাড়ির বাইরে যাবার জো নেই। তাতে ভদ্রঘরের বদনাম হবার ভয় আছে। কিন্তু রাত্তিরের অন্ধকারে তো ইতরভদ্র সবাই সমান। তাছাড়া দেখছেই বা কে?

একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করা হয়নি—এত যাদের চক্ষুলজ্জা, শুক্লপক্ষে তারা কী করে?

টঙ্গিবাড়ি, সোনারং, বজ্রযোগিনী—যেখানেই যাই সেই একই কাহিনি।

শুধু মাধবের মা-র কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। এতিমখানার বাঁশের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে—ওপারে মাধবের মা, এপারে মাধব। মা-র কোলে যাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে মাধব। কিছুতেই যেতে দেবেন না রহমান মাস্টার। মাধবের মা-র সারা গায়ে বিষাক্ত ঘা।

কতদিন পর মাধব দেখছে তার মাকে। কোথায় ছিল এতদিন? না খেয়ে সে যে মরে যাচ্ছিল! কিন্তু এ কোন মাকে সে দেখছে? গায়ের রং এমন কালো হয়ে গেল কেমন করে? গলে গেছে যেন সুন্দর মুখটা। পোড়া কাঠের মতো মা-র এ-চেহারা তো সে কোনোদিন দেখেনি। রহমান মাস্টার, দাও না আমাকে একবার মা-র কাছে যেতে।

যেমন ভালোবাসে, তেমনি হৃদয়হীন রহমান মাস্টার। কেঁদে মরে গেলেও রুগ্ন মা-র কাছে ছেলেকে যেতে দেবেন না তিনি। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা তাঁর, টলাবে সাধ্য কার?

মা যেদিন চলে যায়, এক বছর আগের সেই দিনটার কথা মাধবের একটু একটু মনে আছে। দু-দিন উপোস করার পর কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছিল মাধব। ঘুম ভেঙে উঠে দেখে মা নেই। এপাড়া ওপাড়া কোথাও তার মা

নেই। তারপর গাঁয়ের এক আত্মীয়-বাড়িতে গিয়ে মাধব উঠেছিল। মা কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করতে পাড়ার লোক আঙুল দিয়ে আকাশ দেখিয়ে দিত। সেই আকাশ থেকে যখন বৃষ্টি পড়ত তখন মাধবের মনে হতো দুঃখিনী মা তার কাঁদছে। বর্ষায় মনটা ভারি খারাপ হয়ে যেত মাধবের।

যে-বাড়িতে জায়গা পেয়েছিল মাধব, সেই বাড়িতে লোকগুলো সব হঠাৎ হাত-পা ফুলে মরে গেল। তারপর না খেয়ে ধুঁকতে-ধুঁকতে মাধব এসে জুটল একদিন মেদিনীমণ্ডলের লঙ্গরখানায়। অনেকদিন পর বাজারের এক দোকানদার তাকে নিয়ে আসে এই এতিমখানায়।

এতদিন পর মার বুঝি মনে পড়ল? আকাশ থেকে নেমে আসার সময় হলো? আর আকাশে যখন গেলই, তখন যাবার সময় একবার বলে যেতে পারত না কি? এ এক বছর কী কষ্টে গেছে তার, মা কি তার খবর পায়নি? দেখেনি কি আকাশ থেকে?—মাধব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

মাধবকে দেখে মাধবের মারও বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। দু-দিনের চেষ্টাতেও একমুঠো চাল জোগাড় করে মাধবকে খাওয়াতে না পেরে এক বছর আগে ভোরে উঠে নদীতে ডুবে মরতে গিয়েছিল মাধবের মা। কিন্তু নদীর কনকনে জলে ডুবে মরতে ভয় পেয়েছিল মাধবের মা। ছুটে চলে গিয়েছিল তাই ঘোড়দৌড়ের বাজারে। এক বছর ধরে মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে একমাত্র কামনা ছিল মাধবের মার—মাধব আমার বেঁচে থাক।

সেই মাধব বেঁচে আছে রানিনগরের এতিমখানায়—এ খবর শুনে মাধবের মা ছুটে এসেছিল মাধবকে একবার শেষ দেখা দেখতে। মাথায় একটু বড়ো হয়েছে মাধব! বেড়ার ওপর থেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে কী ইচ্ছেই না হচ্ছিল মাধবের মার। কিন্তু সর্বাঙ্গ যে তার গলে গলে খসে পড়ছে। ছেলের অকল্যাণের ভয়ে মনকে পাষাণ করে নিল মাধবের মা। তারপর একটা হাত দিয়ে দূর থেকে মাধবকে চুমো খেয়ে মাধবের মা অন্ধকারে আস্তে আস্তে চলে গেল।

পরে শুনলাম মাধবের মা ঘোড়দৌড়ের বাজারে আর ফিরে যায়নি। সোজা চলে গিয়েছিল যেদিকে পদ্মা সেইদিকে। এক বছর আগের চেয়েও নদীর জল এবার ঢের বেশি কনকনে হলেও ঠান্ডা জলের নীচে তলিয়ে যেতে মাধবের মার নাকি এবার একটুও ভয় করেনি।

ঢাকা থেকে ফিরে আসছি স্টিমারে। ধু ধু করছে নদী। নদীর নাম কীর্তিনাশা। সাদা বকের মতো পাল উড়িয়ে নৌকো ছুটছে সাঁই সাঁই করে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা সব নৌকোর মাঝি। তাদের বাপ-দাদারা মরেছে পঞ্চাশের আকালে; সামনে বাবলাবনের ভেতর দিয়ে ঝাঁপসা দেখতে পাচ্ছি রানিনগরের এতিমখানা। রোদ্দুরে ঝিকমিক কচ্ছে করোগেটের টিন। দূরে পুতুলের মতো ক্ষুদে ক্ষুদে দেখা যাচ্ছে—কে আলি হোসেন না গৌরাঙ্গ? মজিদ না রাধাশ্যাম?

জলের মধ্যে ছলাৎ করে উঠল কী ওটা? মাধবের মা নয় তো?

কতদিন আগের কথা। চোখ বুজলে আজও যেন সব দেখতে পাই।

বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ

সাতকাহনিয়া, সাগরপুতুল, সাগিরা, কোটালঘোষ, কাঁটাটিকুরি, আয়মা, দর্শিনী, বনবাহিনী—গ্রামগুলোর ভারি সুন্দর নাম। দূর থেকে মনে হয়, দিগদিগন্ত জুড়ে ফসলের মাঠ—সোনার ধান ওড়নার মতো হাওয়ায় উড়ছে। দূরে রোদ্দুরে চিকচিক করছে জল। কাছে যাও সব মরীচিকার মতো মিলিয়ে যাবে। ধান নয়, নিষ্ফল বেনাবন; জলের চিহ্ন নেই, তৃষিত বালুকণা। ফসলের কথা জিজ্ঞেস করলে গাঁয়ের মানুষ মাঠ থেকে মুঠো মুঠো বালি তুলে দেখিয়ে দেবে—মুখে একটা কথাও বলবে না।

স্টেশন থেকে নেমেই একটা ছোট্ট জনপদ। কোঠাবাড়ির পাঁচিলগুলোতে জলের আঁচড় দেখিয়ে একজন বলল, ওটা বন্যার দাগ। দু-মানুষ সমান উঁচু। বর্ষায় এ-অঞ্চলের বাড়িঘর সব ডুবে যায়। মানুষেরা আশ্রয় নেয় কোঠাবাড়ির ছাদে আর খড়োঘরের মটকায়। চারিদিকে থইথই করে জল।

বেনাবনের ভেতর দিয়ে আলে আলে রাস্তা। সাবধানে যেতে হয়—খুরের মতো ধারালো ঘাস পায়ের পাতা কেটে বসে। ঘুপচির মতো হুল ফুটিয়ে দেয় বিছুটি পাতা। তারপর মাঠ। ধু ধু করছে বালি। দুপাশে তাকালে দেখা যায় পোড়োবাড়ির ভিটে, ভাঙা মন্দির—ইঁট ফুঁড়ে বট-অশত্থের গাছ গজিয়েছে। মাঠের মধ্যে বড়ো বড়ো খানখন্দ।

রাস্তাঘাটে মানুষজন চোখেই পড়ে না।

পো গ্রামে ঢুকতেই ময়রাদের পাড়া। বাঁদিকে মস্ত বড়ো একটা বাড়ি। শুনলাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়েছে—বংশে বাতি দেবারও আর কেউ নেই। দিনের বেলা। তবু গা ছম ছম করে।

যে লোকটার কাছ থেকে ময়রাপাড়ার খবর পেলাম, নাম তার মুক্তিপদ বুজ। জাতে সেও ময়রা। এককালে গাঁয়ে দোকান ছিল, এখন সে মাঝে মাঝে পরের দোকানে চাকরি নেয়। আর এ গাঁয়ে যখন মেলা বসে তখন

দোকান দেয়। ময়রার ব্যাবসা ছেড়েছে সে আজ পাঁচ-ছ বছর। পাঁচ-ছ বিঘে জমি ছিল তার, আজ সেখানে শুধু কেশোর বন; বালিতে চাষ করা অসম্ভব। ফসল হয় না, তবু ফি বছর জমির খাজনা গুনতে হয়।

গ্রামে ঢুকে দুশো হাতের মধ্যে ছ-সাতটা পোড়োবাড়ি দেখলাম—সবাই ম্যালেরিয়ায় মরেছে।

অথচ পঞ্চাশ বছর আগেও নাকি বর্ধমানের এসব অঞ্চলে লোকে হাওয়া বদলাতে আসত।

গাঁয়ের বৃদ্ধ ভোলানাথবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। একটা শানবাঁধানো বুড়ো বটের ছায়ায় বসে তিনি পুরোনো দিনের গল্প শোনালেন। কী সুখেই না ছিল এখানকার মানুষ। সত্যিই ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান আর গোয়ালভরা গোরু ছিল। বুড়ো বট তার সাক্ষী। কাঙালি ভোজন করাতে হলে অন্য জেলায় ছুটতে হতো—এ অঞ্চলে কোনো কাঙালি মিলত না।

আজ কেন যে এমন হলো, তা এখানকার শিশুরা পর্যন্ত জানে। বললেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে অজয় নদের দিকে। হিংস্র পার্বত্য নদী অজয়। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে তার উৎস। বর্ষা ছাড়া যে-কোনো সময় যাও, দেখবে ভারি নিরীহ নির্জীব মূর্তি। এর গৈরিক জলে আছে পাথুরে দেশের পলি—যে পলিতে দেদার ফসল ফলে। বর্ষায় উদ্দাম হয়ে ওঠে এই নদী। বন্য হস্তীর মতো বাঁধ ভেঙে মাঠে মাঠে শুরু হয় ধ্বংসের অভিযান—পায়ে পায়ে গুঁড়িয়ে যায় ফসল-ভিটে-মাটি। তারপর শান্ত হয় নদী। খেতের জল শুকোয়, কিন্তু ক্ষত আর শুকোয় না। মাঠ হাঁ করে থাকে বড়ো বড়ো গহ্বরে। স্বর্ণপ্রসূ মাটির ওপর স্তূপাকার হয় বন্ধ্যা বালি।

তাই চল্লিশ বছর ধরে একলক্ষ বিঘেরও বেশি জমি অনাবাদী পড়ে আছে। ন-টা ইউনিয়নের দেড়শোরও বেশি গ্রাম, প্রায় একলক্ষ মানুষের ক্ষেতখামার, ঘরবাড়ি বারবার বন্যায় ভেসে যায়।

পশ্চিমে সাতকাহনিয়া থেকে পুবে সাগিরা পর্যন্ত একটানা চল্লিশ মাইল অজয়ের বন্যারোধী বাঁধ। এটা যেন অজয় অঞ্চলের ভাগ্যরেখা। যেখানে চিড় খাবে, সেই পথেই সর্বনাশ। এর মধ্যে সাতকাহনিয়া থেকে সাগরপুতুল পর্যন্ত বাঁধটুকুই মাত্র সরকারি তদারকির মধ্যে পড়ে। এই অংশটুকুর মধ্যে বাঁধ যদি কোথাও ভাঙে, মেরামতের ভার সরকারের। সরকারের দরদ মানুষের জন্যে নয়, রেললাইনের কিছু না হলেই হল। বাঁধের বাকি অংশ ভাঙলেও, হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষে মরলেও সরকারের যায় আসে না।

বাঁধের যে জায়গাগুলো নদী ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাকে বলে হানা। সাগরপুতুল থেকে সাগিরা পর্যন্ত চার-চারটে হানার সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলো বাঁধতে না পারলে গোটা অজয় অঞ্চল ছারখার হয়ে যাবে।

তাই অজয় অঞ্চলের মানুষ বছরের পর বছর ধরে হানা বেঁধে দেবার জন্যে সেচবিভাগের কাছে বহু আবেদন-নিবেদন করে এসেছে। কোনোই ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা গ্রামের সমস্ত মানুষকে ডেকে নিজেরা তিরিশ হাজার টাকা তুলে বাঁধ মেরামত করল। অনেকেই বিনা মজুরিতে এসে খেটে দিল, গাঁয়ের লোক চাঁদা তুলে তাদের খাওয়াল। সে আজ প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা।

কিন্তু এবার হানা শুধু একটা নয়। আর এতগুলো হানা ভরাট করে বাঁধ বাঁধতে হলে লক্ষ লক্ষ টাকার দরকার। তাই সরকারকে রাজি করাতেই হবে। গ্রামে গ্রামে চলল মিটিং, শহরে দল বেঁধে গিয়ে হাকিম আর উজিরদের ঘেরাও করা হলো। শেষ পর্যন্ত বর্ষার ঠিক মুখে সরকারকে রাজি করানো গেল।

আর কয়েকদিনের মধ্যে বাঁধের কাজ শেষ করতে না পারলে বন্যায় আবার সব ভেসে যাবে। গাঁয়ের লোক হাপিত্যেশ করে আছে কবে ঠিকেদার আসবে, বাঁধের কাজ শুরু হবে।

শেষ পর্যন্ত দলবল নিয়ে একদিন ঠিকেদার এল পুরুচার হানা দেখতে। ঠিকেদার অবাঙালি, সম্ভবত মাড়োয়ারি। খবর পেয়ে ঠিকেদারের তাঁবুর সামনে দু-পাঁচটা গ্রামের হাজার হাজার লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে ছুটে এল।

ঠিকেদার তাদের জিজ্ঞেস করল, 'বাঁধ কিসকো বোলা যাতা হ্যায়?'

শুনে তো সকলের চক্ষুস্থির। যে লোক বাঁধ কাকে বলে জানে না, সে এসেছে বাঁধ বাঁধতে। বাঁধে হাত দেবার আগে গাঁয়ের লোক মাথায় হাত দিয়ে বসল। কিন্তু তীরে এসে যাতে তরি না ডোবে, তার জন্যে সবাই কোমর বেঁধে লাগল। বাঁধ নিজেদের চেষ্টাতেই তুলতে হবে।

পুরুচার গ্রামে এসে দেখি যেন কুরুক্ষেত্র। গ্রামের মধ্যে আর বাঁধের ধারে অসংখ্য শিবির—বেনাঘাসের ছাউনি দেওয়া বাঁশের টোল। বিউগল আর ব্যান্ড বাজছে—বেলুটি থেকে এসেছে ব্যান্ডের পার্টি। সাঁওতাল, বাগদি, বাউড়ি—অসংখ্য লোক কোদাল হাতে করে মাটি কাটছে। মেয়েরা ঝুড়ি হাতে করে লাইনবন্দি দাঁড়িয়ে আছে। মাটির চাপে চাপে উঁচু হয়ে উঠছে বাঁধ। উঁচু হবে চার মানুষ সমান।

বন্যার দেশ বর্ধমান। বছর তিন-চার আগের এক বন্যার কথা মনে পড়ে গেল। সেবার খেপেছিল অজয় নয়, দামোদর। বর্ধমান শহর থেকে মাইল দশেক উত্তরে। জি টি রোডের ওপরে দাঁড়ালেও পায়ের গোড়ালি ডুবে যায়। আশপাশের নীচু জমিতে খড়ের চালাগুলো সব জলের নীচে।

সেই প্রথম বন্যা দেখলাম। আমি আর সুনীল জানা। আমি গিয়েছি খবর আনতে, সুনীল জানা ফোটো তুলতে। সাংবাদিকতায় দুজনের প্রথম হাতেখড়ি। সঙ্গে রাস্তা বাতলাবার জন্যে আছেন ডাক্তার শরদীশ রয়।

যেতে হবে আরও মাইল চার-পাঁচ দূরে। একেবারে হানার মুখে। মওকা বুঝে নৌকো জুটেছে অনেক। তিনগুণ চারগুণ ভাড়া। পকেটে আমাদের যা রেস্ত—তাতে শুধু যাওয়াই যায়, ফেরা যায় না।

এমন সময় গেরুয়া বসনে দেখা দিলেন উদ্ধারকর্তা। সঙ্গে তাঁর একপাল চেলাচামুণ্ডা। হাতে তাদের প্রকাণ্ড এক ফেস্টুন। তাতে কোন এক বৈষ্ণব মিশনের নাম লেখা। বাবাজিকে বেশ একটা প্রমাণ সাইজের প্রণাম জানিয়ে শরদীশ ডাক্তার বললেন, আমাদের উদ্ধার করুন।

মিশনের দু-দুটো নৌকো আগে থেকে বায়না দেওয়া ছিল। নৌকোয় ততক্ষণে চিঁড়েগুড়ের বস্তাগুলো উঠে গেছে। ওগুলো বানভাসি গাঁয়ের লোকদের জন্যে। তাছাড়া আছে ডজন কয়েক পাঁউরুটি, কয়েক টিন মাখন আর দু-হাঁড়ি সন্দেশ। মিশনের কর্মীদের জন্যে।

বাবাজি এতক্ষণ মুখে আকাশছোঁয়া বৈরাগ্যের একটা ভাব নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন। মালপত্তরের দিকে মাঝে মাঝে একটু আড়চোখে নজর রাখছিলেন। মালপত্তর সব উঠে গেলে পর তিনি শরদীশ ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ঘাড় হেলিয়ে জানালেন তথাস্তু।

পাছে পায়ে কাদা লাগে সেইজন্যে বাবাজিকে পাঁজাকোলা করে তোলা হলো নৌকোয়। খানিকটা যাওয়ার পর যখন চারিদিকের ডাঙা একদম মুছে গেল, তখন নড়েচড়ে গান ধরলাম আমরা—স্বদেশি গান। বিরক্ত হয়ে বাবাজি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। নৌকোর নীচে জল ঘুলিয়ে উঠছে, ডুবন্ত তালগাছগুলোর দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায় মিনিটে মিনিটে জল বাড়ছে। গতিক সুবিধের নয়। বাবাজি আমাদের ধমকে থামিয়ে দেবেন, সে উপায়ও নেই। মুখ দিয়ে তাঁর কথা সরছে না। কমবয়সি চেলাদের সে-গান ভালো লাগবারই কথা।

অনেকখানি যাবার পরে দূরে গ্রাম দেখা গেল। নৌকো যাবে না অত দূরে। জলে ডুবে থাকলেও মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা চড়া। কাজেই হেঁটে যেতে হবে।

মিশনের ছেলেরা চিঁড়েগুড়ের বস্তা আর পাঁউরুটির ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে পা টিপে টিপে গাঁয়ের দিকে এগোতে লাগল। বাবাজিকে আমরা বললাম—আপনি থাকুন নৌকোয়। কেন আর কষ্ট করে যাবেন?

বাবাজি নাছোড়বান্দা। দূর থেকে বস্তা আর ঝুড়ির দিকে একবার করে আড়চোখে চান আর উদাস হয়ে বলেন—আহা হা, কেষ্টর জীবগুলোকে না দেখলে হয়? কী কষ্টেই না পড়েছে।

বাবাজিকে নিয়ে যেতে চেলাচামুণ্ডাদেরও ইচ্ছে ছিল না। ওই লাশ তো তাদেরই কাঁধে ভর করবে। কিন্তু লাশ শেষ পর্যন্ত বইতেই হলো।

সারাটা দিন চিঁড়েগুড় বিলি হলো। ওদের সন্দেশ-পাঁউরুটিতে বেশ মোটা ভাগ বসিয়ে আমরা তিনজন সারা গাঁ ঘুরে দরকারি খবর আর ফোটো জোগাড় করতে বেরোলাম। সন্ধের ঠিক আগে নৌকো যখন ছেড়ে দিয়েছে, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমরা চলন্ত নৌকোয় উঠে বসলাম। আমাদের দেখে বাবাজি মুখটা কালো করলেন।

খানিকটা যাবার পর বালির চড়ায় নৌকো গেল আটকে। সবাইকে নামতে হলো। নৌকো ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। বাবাজিরও এবার না নেমে উপায় নেই। নৌকো ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ পেছনে একটা আর্তনাদ শোনা গেল—'গেলাম, গেলাম'। তাকিয়ে দেখি বাবাজি প্রাণপণে হাত তুলে চেঁচাচ্ছেন। চোরাবালিতে তাঁর হাঁটু অবধি ডুবে গেছে। আর সুনীল জানা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে জলের মধ্যে পড়ে যাওয়া তার ক্যামেরাটা তুলতে তুলতে বলছে— ভগবানের নাম করুন।

সবাই মিলে অনেক কষ্টে বাবাজিকে চোরাবালি থেকে টেনে তোলা হলো।

কিন্তু নৌকোয় উঠে বাবাজির দিকে তাকিয়ে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। বাবাজি একদম বদলে গেছেন। তাঁর চোখ আর ঢুলু ঢুলু নয়। রসকষও তাঁর বেশ আসে। আটপৌরে মানুষ যেমন হয় তেমনি।

এতক্ষণে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন---মহাশয়দের নিবাস? আমরা বললাম। আবার জিজ্ঞেস করলেন—মহাশয়দের কী করা হয়? তাও বললাম। শুনে তিনি যা মন্তব্য করলেন তা থেকে বুঝলাম বাবাজি 'শনিবারের চিঠি'ও পড়েন।

পুরুচার বাঁধের কাছে বসে সেই পুরোনো দিনটার কথা ভাবতে ভাবতে একমাত্র আস্ত জানা গান 'বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভা—ঙো' গাইছি, এমন সময় পিঠের ওপর একটা প্রচণ্ড কিল পড়ল। ফিরে তাকিয়ে দেখি বিজন ভট্টাচার্য, সঙ্গে শম্ভু মিত্র।

'এই কী হচ্ছে? বর্ধমানে ও-গান বেআইনি জানো না?'

এতক্ষণ আমার খেয়ালই ছিল না। কী সর্বনাশ। কী সর্বনাশ। লোকে শুনলে তো বাঁধের নীচেই আমাকে জ্যান্ত মাটিচাপা দিত।

সারাটা দিন চলে বাঁধ বাঁধার উৎসব। সবাই কোনো-না-কোনো কাজে হাত লাগিয়েছে। একটা জায়গায় বেশ ভিড় জমে গেছে। ব্যাপারটা কী?

গিয়ে দেখি কোদাল হাতে হায়াত সাহেব মাটি কাটছেন। আর সেই মাটি ঝুড়িতে করে মাথায় তুলে বাঁধের ওপর ফেলে দিয়ে আসছেন সঈদুদ্দিন সাহেব। একজন যেমন মশার মতো রোগা আর একজন তেমনি মোষের মতো মোটা। ছোটো ছোটা ছেলেরা হাততালি দিয়ে হাসাহাসি করছে। দুজনেই এ অঞ্চলের গণ্যমান্য লোক। অনেক দিনের জেলখাটা স্বদেশি। কৃষক সমিতি এমন মানীগুণী লোকদেরও হাতে কোদাল আর মাথায় মাটির ঝুড়ি দিয়ে কাজে নামাতে পেরেছে দেখে গাঁয়ের চাষিদের ভারি ফুর্তি।

বিকেলে মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু তার জন্যে মিটিং কেন ঠেকে থাকবে? দূর দূর গ্রাম থেকে লাল নিশান উড়িয়ে এল একটার পর একটা মিছিল। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কুচকাওয়াজ করতে করতে আসছে

একটার পর একটা সৈন্যবাহিনী। দেখতে দেখতে বাঁধের নীচে ছ-সাত হাজার লোকের ভিড় জমে উঠল। শহর থেকে ভাড়া করা মাইক এসেছে। গোটা তল্লাট গম গম করছে তার আওয়াজে। নদীর ওপারের গ্রামগুলোতেও সভার ডাক পৌঁছুবে।

সন্ধেবেলা গানের জলসা বসল সমিতির শিবিরে। গায়কেরা বসলেন উঁচু মাটির দাওয়ায়। সেটাই হল রঙ্গমঞ্চ। সামনের উঠোনে জলকাদার মধ্যে উবু হয়ে হয়ে বসল শ্রোতার দল। কয়েক হাজার হবে।

বাঁধ নিয়ে গান বেঁধেছে গাঁয়ের চাষিরা। তাদের এতদিনের দুঃখের পালা এবার তারা নিজের হাতে চুকিয়ে দেবে, এই একটি আবেগ তাদের সবাইকার গানে। সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে এসেছেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দুজন সেরা শিল্পী—বিজন ভট্টাচার্য আর শম্ভু মিত্র। গাঁয়ের লোকে জমজমাট জলসা অনেকদিন শোনেনি।

জমিদারবাড়িতে পূজাপার্বণে কিংবা বিয়েসাদির সময় আগেকার আমলে শহর থেকে নাম করা গাইয়ে-বাজিয়েদের বায়না দিয়ে আনা হয়েছে বটে, কিন্তু তারা কখনও তাদের গানে চাষিদের কথা বলেনি। যতটুকু যা বলেছে, তাও হাসিমশকরা করার জন্যে। সে সব গাইয়েদের ঢংঢাংও লোকের ভালো লাগেনি।

কিন্তু সমিতি যাদের এনেছে, তারা কিন্তু ভারি সাধাসিধে। প্রথমটা তো তারা বুঝতেই পারেনি। ভেবেছিল হয়তো কমিটির লোক হবে। গান শুনে তবে বুঝল লোকগুলো যে সে নয়, গানবাজনায় ওস্তাদ। আর কী গান। চাষিদের মনের কথা গাইয়ে বাবুরা জানল কেমন করে?

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরও বাঁধের মজুররা অনেক রাত্তির পর্যন্ত ঠায় উবু হয়ে বসে গান শোনে।

জীবনে তাদের এ-অভিজ্ঞতা এই প্রথম। লোকে হালগোরুর মতো পয়সা দিয়ে খাটিয়ে নেয়, চোখ রাঙায়। তাই ফাঁকি দিতে পারলে তারা ছাড়ে না। আর এখানে এসে তারা শুনল—তাদের হাতে নাকি ন-টা ইউনিয়নের জীবনমরণ। তারাও তো এই বন্যার অভিশাপেই আজ নিঃস্ব। ভাঙা চাল ছাইবার জন্যে একমুঠো খড় পায় না। খড় পাবে কোথায়? ধানের জমিগুলো বন্যায় ভেসে যায়। ছেলেমেয়েরা সারাটা শীত ঠকঠক করে কাঁপে। তারপর ম্যালেরিয়ায় জীবনান্ত হয়। গাঁ ছেড়ে দলে দলে লোক তাই দেশান্তরী হচ্ছে। চাষ-আবাদ ছেড়ে লোকে শহরে গোলামি করতে ছুটছে।

বাঁধ বাঁধা হচ্ছে শুনে গাঁয়ের বড়োলোকেরা তাই এবার পুকুর কাটাবার জন্যে, বাগান করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তারা গাঁয়ের দিনমজুরদের বেশি মজুরির লোভ দেখিয়েছিল। তবু তারা গাঁ ছেড়ে বাঁধ বাঁধতে এসেছে। বাঁশের টোলে জল পড়ে, চিঁড়েমুড়ির ব্যবস্থা নেই, মুনশিরা চুয়োর ঠিকমতো মাপ নেয় না—ঠিকেদারদের শত দুর্ব্যবহার সহ্য করেও তারা আছে।

তারা চোখের ওপর দেখছে এই গাঁয়েরই গরিব চাষি ব্রজেশ্বর গড়াই মাটি কাটার জন্যে তার নিজের জমি, ভলান্টিয়ারদের জন্যে তার নিজের ঘর ছেড়ে দিয়েছে। বিনা মজুরিতে সে সকলকে রেঁধে খাওয়াচ্ছে।

সাত্তার সাহেব নিজের খরচে ইউনিয়নের কর্মীদের জন্যে আলাদা তাঁবু ফেলেছেন।

মাথার ওপর খাঁড়ার মতো ঝুলছে উদ্যত বর্ষা। ছোটনাগপুরে পাহাড়ের জটায় জটায় এখন বন্দি হয়ে আছে দু-চারটি দিনের বৃষ্টির জল। জটার বাঁধন খুলতেও বেশি দেরি নেই। জঙ্গল-পাহাড় ভেঙে কবে দুরন্ত ঢল নামবে কে জানে? ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে অজয়ের দুই তীরের মানুষ।

পুরুচার মানুষগুলো কিন্তু অজয়ের চোখে চোখ রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। অদৃষ্টের লিখনকে তারা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে নিজেদের হাতে নিজেদের ভাগ্য রচনা করার ভার নিয়েছে।

তারা হেঁকে বলছে, দেখো—

আকাশে মেঘের ঘনঘটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঁধ উঠছে, দেখো—চার মানুষ সমান উঁচু বাঁধ।

শালমহুয়ার ছায়ায়

মেদিনীপুর শহরের ওপর দিয়ে পাকা সড়ক গেছে পুব থেকে পশ্চিমে—বাঁকুড়া আর রানিগঞ্জ থেকে কটক আর বালাসোরের দিকে। এই রাস্তায় যদি কখনও এসে দাঁড়াও দেখবে এপারে-ওপারে দুখানা হয়ে আছে মেদিনীপুর জেলা।

ওপারে মাকড়া পাথরের ঢেউ-খেলানো মাঠজমি। দুধারে অনুর্বর উঁচু জমির মাঝখানে ছোটো ছোটো খোয়াই—সেখানে বোনা হয় ধান আর কলাই। মাঠজমি পেরিয়ে বড়ো বড়ো শাল-মহুয়ার গাছ, বিশাল অরণ্য। আর এপারে পলি পড়া সমতল, নদীনালার কোলে দিগন্তছোঁয়া সবুজ ফসল আর মুখরিত গ্রাম। ওপারের বায়ুকোণে ছোটনাগপুরের পাহাড়তলী; এপারের অগ্নিকোণে বঙ্গোপসাগর। ওপারে সাঁওতালদের সন্তভুঁই; এপারে তাম্রলিপ্ত আর নগর চন্দ্রকোণা। ওপারে জঙ্গলমহাল, এপারে ক্ষেতখামার।

কেশপুর থেকে হাঁটা রাস্তায় চলেছি শালবনীর দিকে। যেতে যেতে মাটির রং বদলায়। পারুলিয়া, শীর্ষা, পারকোলে পার হয়ে বনের ভেতর দিয়ে রাঙা মাটির রাস্তা। তেঁতুলমুড়ির বন পেরিয়ে মহিষডুবির বন। মাঝখানে ছোটো ছোটো জনবিরল গ্রাম—ওপর সাতশোল, মধ্য শাতশোল, নীচু সাতশোল। বনের মধ্যে সরু সরু ঝরনার নদী। কাঠের বেড়া দেওয়া ছোটো ছোটো কুঁড়েঘর। রাস্তায় দু-চারটে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। আর জনমনুষ্য নেই।

পায়ের নীচে উঁচু-নীচু শক্ত পাথুরে মাটি তেতে আগুন হয়ে আছে। বিশাল বন, কিন্তু কোথাও এতটুকু ছায়া নেই। দুপাশে শুধু লতাপাতা। ক্লান্ত মানুষকে ছায়া দিতে পারে এমন গাছ নেই। যুদ্ধের ঠিকেদাররা যা পেয়েছে সব চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেছে।

যুদ্ধে কাঁচা শালকাঠ বেচে এরা লাল হয়ে গেছে। তবু এদের লালসা মেটেনি। চারাগাছগুলো পর্যন্ত এরা কেটে সাফ করেছে। আর কিছুদিন এভাবে চললে মেদিনীপুরে বনজঙ্গলের আর চিহ্ন থাকবে না। এভাবে জঙ্গলঝাড়াই আজ নতুন নয়; গত ষাট-সত্তর বছর ধরে ব্যাবসাদাররা এখানকার বনজঙ্গল থেকে নির্বিচারে কাঠ কেটে কলকাতায় চালানি কারবার চালাচ্ছে। যুদ্ধের মধ্যে সেটাই আরও তীব্র আকার নিয়েছে। স্টেশনে সাজানো কাঠের স্তূপগুলো দেখলে দূর থেকে ছোটো ছোটো টিলা বলে ভুল হয়।

এর সর্বনাশা ফল ফলতে শুরু করেছে। কেশপুর থেকে ঘাটাল পর্যন্ত মাইলের পর মাইল সেই দৃশ্যই দেখে এলাম।

চারিদিকে খরা-লাগা মাঠজমির ফুটিফাটার মতো অবস্থা। এককফোঁটা বৃষ্টি হবে কোথা থেকে? বৃষ্টির যারা উৎস, সেই বনজঙ্গলগুলোই যে সাফ হয়ে যাচ্ছে।

মেদিনীপুর থেকে কেশপুর বাসে আসতে একেবারেই ভিড় ছিল না। বাসের কন্ডাক্টর দুঃখ করে বলল, বাজার বড্ড খারাপ পড়েছে, বাবু; বাসে আর প্যাসেঞ্জার পাই না। অন্য অন্য বছর এ সময়টাতে লোকে ঝুলতে ঝুলতে যায়। রাস্তার মাঝখান থেকে লোক নেওয়ার আর জায়গা হয় না। অন্য অন্য বছর এতদিনে চাষবাস সব সারা। গাঁয়ের লোক জিনিসপত্তর কেনাকাটা করতে শহরে যায়। মামলা-মোকদ্দমারও ধুম পড়ে। তাই বছরের ওই সময়টা বাসওয়ালাদের মরশুম।

কিন্তু এবার বৃষ্টির অভাবে কেউ চাষবাস করতে পারেনি।

রাস্তার দুপাশে তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। মাঠে মাঠে জ্বলে যাওয়া হলুদবর্ণ ধান। পৃথিবীর সারা অঙ্গ যেন আগুনে ঝলসানো।

শহরে গ্রামে সকলেরই মুখে আতঙ্কের ছাপ। পঞ্চাশ সালে তবু তো মাঠে ফসলের আশা নিয়ে চাষিরা দুর্ভিক্ষের দুটো মাস শাকপাতা খেয়ে কোনো রকমে কাটিয়ে দিয়েছিল। এবার একটা নয়, দুটো নয়—সামনের পনেরোটা মাস ফসল পাবার কোনো লক্ষণ নেই। মানুষ কী করে বাঁচবে? শহরের চায়ের দোকানে, ডাক্তারখানায়, কোর্টকাছারির বটতলায়—সকলেরই মুখে এক কথা। মানুষ কী করে বাঁচবে? গাঁয়ের চাষি যদি মরে, শহরের উকিল, ডাক্তার, দোকানির পেটেও যে টান পড়বে।

ধ্বংস আর মৃত্যুর সেই করাল মূর্তি দেখেছিলাম তিন বছর আগে। তমলুক মহকুমায়।

মহিষাদলে যাবার রাস্তায় শ্মশানের পর শ্মশান। ফাঁকা ফাঁকা মাঠ; মাঝখানে পড়ে আছে অসংখ্য নতুন মাটির কলশি। লোকে বলল, শ্মশানগুলো সবই নতুন হয়েছে। আগে ধানচাষ হতো এইসব জমিতে। দু-দিন আগে এলে দেখতেন না-খেয়ে মরা মানুষগুলো বাড়ির উঠোনে উঠোনে পচে ভেপসে উঠেছে, তাদের লাশগুলো শেয়াল আর শকুনিতে ছিঁড়ে খাচ্ছে। মাঠে নিয়ে গিয়ে মড়া পোড়ানোর কারো সামর্থ্য ছিল না।

খালের ধারে এসে হঠাৎ আঁতকে উঠেছিলাম। দুপাশে বাঁধের গায়ে সারবন্দি কঙ্কাল। মাথার খুলি আর পাঁজরের হাড়গুলো এমনভাবে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে যে দেখে মনে হয় যেন তারা পরস্পরে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে যেতে চাইছে।

রাস্তার দুপাশে গায়ে গা-দিয়ে রয়েছে একটানা অনাবাদি জমি। রোদ্দুরে চোখ চাওয়া যায় না। মাঠে ক্বচিৎ কদাচিৎ গোরু চোখে পড়ে। আগে নাকি গোরুতে গোরুতে সাদা হয়ে থাকত সবুজ মাঠ।

সুতাহাটার রাস্তায়ও সেই একই দৃশ্য। রোদ্দুরে সাদা সাদা হাড়পাঁজর চিক চিক করছে খালের দুধারে। এক গেলাস জল খাবার জন্যে হাতিবেড়া গ্রামে ঢুকে কোনো বাড়িতেই ডেকে ডেকে কারও সাড়া পেলাম না। অনেক হাঁকডাকের পর এক বাড়ি থেকে জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল এক বুড়ো। দেখলাম বুড়োর হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে। বুড়ো বলল, জল গড়িয়ে দেবারও লোক নেই কেউ। ভেতরে এসে নিজেই নিয়ে খান।

বুড়োর আপন বলতে কেউ নেই। এক ছেলে ছিল, সেও বিবাগী হয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। গাঁয়েও আর কেউ নেই। সব উজাড় হয়ে গিয়েছে। যারা কোনো রকমে বেঁচেবর্তে ছিল, চাটিবাটি উঠিয়ে তারা গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে। রানিচকেরও সেই একই কাহিনি।

চিরঞ্জীপুরে সনাতন মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম। সনাতনের ঠিক পাশেই তিন মাথা এক করে বেঞ্চের ওপর বসে একজন। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। দেখে মনে হলো সনাতনের দাদা। জিজ্ঞেস করলাম—আপনার দাদার কি জ্বর হয়েছে? সনাতন প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপরই বলল—দাদা নয় তো, ও আমার ছেলে। বছর কুড়ি বয়স হবে ওর। ভুগে ভুগে অমনি চেহারা।

গাঁ থেকে বেরিয়ে মনে হলো পালাতে পারলে বাঁচি।

চক-তাড়নায় এসে দেখি খালের দুধারে আবার সেই নরকঙ্কালের মিছিল। রাস্তায় একজন লোক আমার মুখের চেহারা দেখে বলল, এ আর কী দেখছেন! আগে যান, পুরুষ মানুষের মুখ দেখতে পাবেন না।

একটু এগিয়ে দেখি সত্যিই তাই। দুদিকে গ্রাম খাঁ খাঁ করছে। বিধবার রাজ্যে এসে পড়েছি যেন।

হলদি নদী পার হয়ে তেরোপাখিয়ার হাট। রাত্তিরটা কাটাতে হয়েছিল পান্থশালায়। সরু সরু ছোট্ট খাট জোড়া দিয়ে ফরাস পাতা ঢালাও তেলচিটে ময়লা বিছানা। খাটগুলো যেন ছারপোকার ডিপো। জঙ্গি বিমানের মতো একরোখা মশাগুলো গোঁত্তা খেয়ে গায়ের ওপর হুল বসিয়ে দেয়।

পান্থশালায় ফড়ে আর ব্যাপারীর ভিড়। ছারপোকা আর মশার কামড়ে ঘুম হয় না বলে সারা রাত হুঁকো টানতে টানতে তারা গল্পগুজব করে কাটিয়ে দেয়। শুয়ে শুয়েই ধানচালের দরদস্তুর করে, আর ফন্দি আঁটে কেমন করে বেশি দামে চালান দেওয়া যায়।

গেঁওখালির হাটে যা দেখেছি, তার কাছে তেরোপাখিয়া তো কিছুই নয়। রূপনারায়ণ আর গঙ্গা যেখানে এসে মিশেছে, সেখানটায় হাওড়া-চব্বিশ পরগনা-মেদিনীপুর তিন-তিনটে জেলার সীমানা। নদীর পাড়ে অসংখ্য ছোটো ছোটো জেলে ডিঙি। মাঝনদীতে বড়ো বড়ো নৌকা দাঁড়িয়ে। ছোটো ছোটো ডিঙিতে বস্তা বস্তা চাল উঠছে। তারপর ডিঙিগুলো ভরতি হলে সেই চাল গিয়ে জমা হবে বড়ো বড়ো নৌকোয়। জমাদার আছে, সেপাই আছে, ডজনখানেক হোমগার্ডও আছে। কিন্তু ছুঁচের ভেতর দিয়ে দিব্যি হাতি গলে যাচ্ছে। সরকারের আইন—একসঙ্গে বিশ মনের বেশি ধানচাল জেলার বাইরে যেতে পারবে না। যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে—তারই জন্যে এই অভিনব চোরাই ব্যবস্থা। গোলাদার আর পাইকাররা ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে দুহাতে পয়সা লুটছে।

নন্দীগ্রামে গিয়ে শুনেছিলাম আধমন ধানের বদলে এক গরিব চাষি দিনকয়েক আগে এক বিঘা চাষের জমি বেচে দিয়েছে।

পুরুষোত্তমপুরের কৃষ্ণদাস অগস্তির কথা আজও মনে হলে চোখে জল আসে। কৃষ্ণদাস ছিল ও অঞ্চলের কিশোর বাহিনীর সেরা নেতা। রোগা ছিপছিপে কালো চেহারা। চোখ দুটো টানা টানা। কোঁকড়া চুল। লাজুক

লাজুক মুখের ভাব। ভারি মিষ্টি স্বভাব। তোতলামির জন্যে এমনিতেই কথা কম বলত। বাড়ির অবস্থা ছিল খুবই খারাপ।

অভাবে অভাবে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণদাসের বাবার। একেই খাওয়া জোটে না, তার ওপর বাড়িতে অশান্তি। অভিমান করে চলে যাচ্ছিল কৃষ্ণদাস যেদিকে দুচোখ যায়। বেশিদূর যেতে পারেনি। পাশের গাঁয়ে এক জমিদার বাড়ির সামনে ঝোপের মধ্যে ভাঙা একটা পালকি পড়েছিল। না খাওয়ার দরুন শরীর টলছিল বলে সেই পাল্কির মধ্যে রাত্তিরে আশ্রয় নিয়েছিল কৃষ্ণদাস।

এদিকে সারা গাঁয়ে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গিয়েছে। কৃষ্ণদাসকে সবাই ভালোবাসে। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পারঘাটার লোকগুলো বলল—কই, কৃষ্ণদাস তো এদিকে আসেনি।

খুঁজতে খুঁজতে তিন দিন পর ভাঙা পালকির ভেতর থেকে কৃষ্ণদাসের লাশ পাওয়া গেল। গোটা গাঁয়ের লোক সে রাত্তিরে ঘুমোয়নি।

পাঁশকুড়া থেকে বাসে যেতে সতেরো নম্বর ইউনিয়ন। আকালের বছরে সেখানকার দশ জন পিছু একজনকে যমের মুখে তুলে দিতে হয়েছিল।

পূর্বচিল্কার রাস্তায় শকুন্তলার বাঁধের ওপর দেখেছিলাম কঙ্কালসার মানুষের মিছিল। ছেঁড়া মাদুর, মাটির হাঁড়ি আর পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় নিয়ে তারা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কেউ নাগপুরে, কেউ উড়িষ্যায়। গাঁয়ে ফসল উঠলে আবার তারা বাপ-দাদার ভিটেতে ফিরে আসবে। এখন তাদের একমাত্র চেষ্টা যাতে দিনকতক বেঁচে থাকতে পারে। যদি মরতেই হয়, ফিরে এসে ঘরের উঠোনে মরবে। পরে শুনেছি তাদের মধ্যে খুব কম লোকই প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিল।

দু-বছর পরে মেদিনীপুরে ফিরে এসে জ্বলে-যাওয়া মাঠে মাঠে আবার সেই আকালের যেন আভাস পাচ্ছি। তমলুকের 'পুওর-হাউস'। সেবার সব থেকে শেষে এসেছিল পরমানন্দপুরের অমূল্য পাত্র। সোনারুপোর কাজ করত সে। শেষ সোনাদানা বেচে দিয়েও যখন বাঁচতে পারেনি, তখনই সে ছেলে-বউয়ের হাত ধরে সরকারি 'পুওর-হাউসে' এসে উঠেছিল। এবার আকাল লাগলে দিনমজুর মাহিন্দারের সঙ্গে স্বর্ণকার অমূল্য পাত্রের কোনো তফাত থাকবে না। সবাই একসঙ্গে রসাতলে যাবে।

রোড চন্দ্রকোণা থেকে ঘাটাল পর্যন্ত বিরাট এলাকা জুড়ে রাস্তার দুপাশে ফসলের কোনো চিহ্ন নেই। শ্রাবণ গেল, ভাদ্র গেল, আশ্বিনও যায় যায়। বৃষ্টির আর কোনো আশা নেই দেখে চোখের জল মুছতে মুছতে চাষিরা বওড়া আর মুগ বসান, শুকনাশ আর মানুষমারির মাঠে গোরু ছেড়ে দিয়েছে। ধানের চারাগুলো একেবারে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার চেয়ে বরং গোরুতেই খাক।

বরাবরকার বন্যা-অঞ্চল বাঁকা, জলসরা আর ক্ষীরপাই। সেখানকার নীচু মাঠঘাট শুকনো ঠনঠন করছে। বাঁকা নদীর ওপর দিয়ে লোক হেঁটেই পারাপার করছে। পুকুরগুলো এরই মধ্যে শুকিয়ে গেল। লোকে দু-দিন পর তৃষ্ণার জলও পাবে না।

গাঁয়ে গাঁয়ে মজুরেরা বেকার। কারো জমিতে ফসল নেই, খাটাবে কে? তাই তারা গাঁ থেকে চাটিবাটি উঠিয়ে ছেলে-বউ নিয়ে দক্ষিণের দিকে চলেছে। একবার কপাল ঠুকে দেখবে যদি কাজ পাওয়া যায়।

এদিকে জমিদারদের কাছারিগুলো আবার সরগরম হয়ে উঠছে। ফসল হোক না হোক, আশ্বিন কিস্তির খাজনা তারা আদায় করে ছাড়বে। তারই জন্যে নায়েব গোমস্তারা ছুরি শানাচ্ছে।

সাঁওতালরা পথে বেরিয়েছে। জঙ্গল গিয়ে তাদেরও ভেঙেছে শান্তির নীড়। বন নেই, শিকার নেই—কী নিয়ে আর থাকবে? দু-চারজন আজও মায়া কাটাতে পারেনি, তাই আজও বনের মাটি কামড়ে পড়ে আছে। সন্ধেবেলায় নির্জন বনে শুধু তাদেরই নিঃসঙ্গ মাদল বেজে ওঠে।

সাঁওতালরা কাজ নিয়েছে শালবনীর পাশেই ঝড়ভাঙা ডিগরির বিমানঘাঁটিতে। কেউ কেউ নামালের দিকে চলে গেছে পরের জমিতে খাটাখাটনি করতে। বন থেকে অনেক দূরে শহরের পাশে বসেছে সাঁওতালদের নতুন আস্তানা। সন্ধে হলে তেমনি মাদল বাজায়, কিন্তু ট্রেনের বাঁশিতে আর ট্রাকের শব্দে গানের সুর ডুবে যায়।

শহরের ধূলিধূসর শ্রমিকজীবনে তারা এক নতুন আস্বাদ পেয়েছে। যন্ত্র তাদের জাদু করেছে। বিরাট যন্ত্রদানব চোখের পলকে আকাশে উড়ে যায়; একটা বুলডোজার একা পাঁচশো মানুষের সমান কাজ করে। পিচঢালা রাস্তা দিয়ে সাঁওতাল মেয়েদের নিয়ে মিলিটারি ট্রাক হাওয়ার বেগে ছুটে যায়। ফুর্তিতে তারা গেয়ে ওঠে সাঁওতালি ঝুমুর। নতুন জীবন নিয়ে তারা গান বাঁধে :

ধানকলের বাঁশি বাজছে
যেতেও তো হবে অনেকখানি রাস্তা।
আর তো জঙ্গল নেই যে ফুল ফুটে থাকবে;
আর তো ফুল নেই, তোর খোঁপায় বেঁধে দেবো।
আর তো শিকার নেই যে মাদল নিয়ে বনে বনে ঘুরবি।
আর আমরা পাব ধানকলে যাবার ছুটি।
কদু ঘাসও তো শুকিয়ে গেছে,
কদুর মূলও তো ফুরিয়ে গেছে
ফিরে এসে কী খাবি?
চল, ধানকলেতে চল।

মাদল বাজিয়ে তারা গায় :

মিলিটারি এল।
মিলিটারি আসার ফলে এক টাকার জিনিস হলো তিন টাকার।
এখন আর কাজের ভাবনা নেই—
আর নামাল দিয়েও খাটতে যেতে হবে না।
পারকুলোর বদলে এখন ধান পাব—ধান।
যাবার আসবার ভাবনা নেই
খাটবারও আর ভাবনা নেই
জঙ্গল হয়ে উঠেছে শহর।
হাওয়াই জাহাজের চিৎকারে আর গোলমালে
ঘুমোনোও হয়ে উঠেছে দায়।

আমাদের কল্‌মা সাঁওতালনি
তার মাথায় উঠেছে তেল।
খোঁপাতে আবার ফুল গুঁজেছে
কোত্থেকে পেল কে জানে?
এখন গাঁয়ের মধ্যে চাল পাবি না
পাবি রোডে।
তাও চাল নয়,
পাবি ভাত—গরম ভাত।
কাজ খুব, কিন্তু তবু তো কাজ।
হাতেও তো কিছু করলি।
তবে দেখিস ভাই, ট্রাকের নীচে পড়িস না।

শাল-মহুয়ার বন উজাড় করে মিলিটারির ছাউনি পড়েছে মাইলের পর মাইল। ঝড়ভাঙায় তা দেখেছি, দেখলাম সরডিহায়। যে অঞ্চলে মিলিটারি, সে অঞ্চলে বদলে গেছে গাঁয়ের চেহারা। কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে। গাঁয়ের আকাশ ধুলোয় ধুলো হয়ে থাকে লরির চাকায়। যেখানে দোকান ছিল না, সেখানে দোকান, যেখানে ঘর ছিল না, সেখানে পাকা দালান উঠেছে। গাঁয়ে এতদিন যারা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরত তাদের মধ্যে একটু করিতকর্মা লোক যারা—তারা ঠিকেদারি করে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। পাঁচ আঙুলের চার আঙুলে এখন তাদের হিরে বসানো আংটি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি। পায়ে রংচঙে নাগরা। কেউ কেউ চোখে বিনা পাওয়ারের চশমা লাগিয়ে দোকানে উলটো করে কাগজ ধরে দেখায় কত পড়েছে।

কাছেই খড়কডিহা গ্রাম। তেমাথায় একটা ফলারের দোকান। চা-ও পাওয়া যায় সেখানে। পাট-ভাঙা টকটকে লাল-পাড় শাড়িপরা একটি মেয়ে সেই দোকানের মালিক। দেখে মনে হয় এই গাঁয়েরই মেয়ে।

অনেকক্ষণ থেকে ভাবছিলাম এ অঞ্চলের একজন পুরোনো কংগ্রেস নেত্রীর কথা জিজ্ঞেস করব—তিরিশ সালে সারা বাংলাদেশ যাঁর নাম শুনেছিল। চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম—'আচ্ছা, বীরকন্যার কী খবর?' এদিককার লোকের দেওয়া নাম বীরকন্যা।

উত্তরে যা পেলাম গরম চায়ে আমার মুখ পুড়ে যাবার যোগাড়। ফলারের দোকানের মেয়েটি মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'সে অনেক হিস্ট্রি, মশাই।' হিস্ট্রি কথার মানেটা জানা থাকলেও, কথাটা এমন একজনের মুখ থেকে শুনলাম যে, নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। পরে যখন দেখেছিলাম গোরু চরাতে চলাতে রাখাল ছেলেরা একজন আর একজনকে 'হ্যালো জনি, হ্যালো জনি' বলে ডাকছে, তখন বুঝেছিলাম গোরা পল্টনরা এসে গাঁয়ের লোকের মুখে দো-আঁশলা শব্দ যুগিয়েছে। কিন্তু বীরকন্যার খবর জিজ্ঞেস করেও আর কিছু পাওয়া গেল না।

মাথায় তখন একটা বুদ্ধি এল। ঠিক করলাম একজন নাপিত ধরতে হবে। নাপিতরা সব দেশেই লোকের হাঁড়ির খবর রাখে। খুঁজতে খুঁজতে স্টেশনের কাছে একজনকে পাওয়া গেল। চুল ছাঁটতে বসে গেলাম। যা আন্দাজ করেছিলাম তাই। গাঁয়ের সমস্ত খবর তার নখদর্পণে।

যা জানতে পারলাম তা এই—

বীরকন্যাকে আজ আর কেউ বীরকন্যা বলে না। আজ সে মিলিটারির ঠিকেদার। তিরিশ সালে জেল খেটে আসার পর জেলে সে আরও অনেকবার গেছে। কিন্তু স্বদেশি করে নয়, ফৌজদারি মামলায়। এ গাঁয়ে সে কবে কেমন করে এসেছে কেউ জানে না। শোনা যায়, সে নাকি ভিন্‌গাঁয়ের ধোপার মেয়ে। এ গাঁয়ে মাহাতোদের ঘরেই সে মানুষ। মাহাতোরা নাকি সাঁওতালদের চেয়ে একটু উঁচু জাত। তিরিশ সালের ঢেউ এ-গাঁয়ে এসে যখন লাগল, তখন সকলের আগে তিনরঙা নিশান নিয়ে দাঁড়িয়েছিল গাঁয়ের এই বাপ-মা মরা মেয়েটা। চোখে তার আগুন জ্বলে উঠেছিল, আর সেই আগুনে জাগিয়ে তুলেছিল সে ঘুমন্ত গোটা তল্লাটকে। হাজার মানুষের যে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে উঠেছিল, দুঃখে-পোড়া মেয়েটাই হলো তার অধিনেত্রী। মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল তার নতুন নাম বীরকন্যা। সারা তল্লাটে সেদিন বন্দেমাতরম ছাড়া আওয়াজ নেই। মুক্তিপাগল মানুষের সেই উদ্ভ্রান্ত মিছিল হারিয়ে গেল বন্দিশালায়। জেলের কষ্টকে কেউ কষ্ট বলে মনে করেনি। কষ্ট হয়েছিল স্বদেশি বাবুদের দেখে। তাঁরা চাষিদের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। তারা যেন মানুষই না। বাবুরা বলেছিলেন, জেলে গেলে দেশ স্বাধীন হবে। জেলে তো তারা হাজারে হাজারে গেল, দেশ তো কই স্বাধীন হলো না! জেল থেকে ফিরে ক-বছর কী কষ্টেই না দিন গেছে। বাবুদের আর টিকি দেখা যায়নি। দেখা গেল ভোটের আগে। বাবুরা বললেন—কংগ্রেসকে ভোট দিলেই এবার দেশ স্বাধীন। ভোট তারা দিয়েছে, তবু দেশ তো স্বাধীন হয়নি। বড়োলোকেরা কেবল গরিবদের এমনি করে ঠকিয়ে এসেছে। অন্ধ রাগ আর তাদের দিশাহারা অভিমান আকাশপ্রমাণ হয়ে উঠল।

এই কবছরেই বীরকন্যা মরে গিয়ে হলো বিষকন্যা।

ঠিক করলাম একবার নিজের চোখে দেখতে হবে মরে যাওয়া বীরকন্যাকে।

ঘেরা উঠোনের মধ্যে টিনের আটচালা। সন্ধে ঘনায়মান। দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করছি। গল্প বলছে মরে যাওয়া বীরকন্যার পাতানো ছেলে। খড়্গপুরের লাইনে রোজই লুঠতরাজ আর রাহাজানি হচ্ছে, টেলিগ্রামের তার আর ওয়াগন-মাল হাওয়া হয়ে যাচ্ছে—কেমন করে, তার কাহিনি।

দুর্ভিক্ষের আগে এ-অঞ্চলে চোরডাকাতের বালাই ছিল না। পেটে যখন আগুন লাগল, দলে দলে গ্রামের লোক এসে তখন রেলের স্টেশনে ভেঙে পড়ল। মালগাড়ির তলার ফুটো দিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ত ধানচাল, রেললাইনের ওপর থেকে খুঁটে খুঁটে সেই চাল কুড়িয়ে নিত তারা। এত লোকের তো তাতে কুলোয় না। তাই ছড়ানো চালের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মালগাড়ির ফাঁকের ভেতর লোহার ছুঁচালো শিক গলিয়ে দিয়ে বস্তা ফাঁসানোর ব্যবস্থা হলো। তাতেও চাহিদা মেটে না। শিকের বদলে এবার জোগাড় হলো বড়ো বড়ো লোহার শাবল। যাদের গায়ে কিছুটা জোর আছে, যারা একটু বেপরোয়া গোছের, তারা রাতের অন্ধকারে শাবল চালিয়ে মালগাড়ির দরোজা ফুটো করতে শুরু করল। কিন্তু তাতেও ঝকমারি অনেক। হল্লা হয়, পুলিশ আসে, হাতে হাতকড়া পড়ে! তাই ওদের মধ্যে যারা একটু হুঁশিয়ার গোছের লোক, তারা মাথা খাটিয়ে এমন সব সূক্ষ্ম অস্ত্র তৈরি করতে লাগল যা দিয়ে নিঃশব্দে মালগাড়ির দরোজা একেবারে সটান খুলে ফেলা যায়। তারপর ভেতরে ঢুকে টেনে বার করো বস্তা বস্তা চাল। হলোও তাই।

এদিকে মাঠে মাঠে সোনালি ধান উঠল। যে-সব চাষি না খেতে পেয়ে রেললাইনের ধারে এসে এতদিন দিন কাটাচ্ছিল, তারা ছেলে-বউয়ের হাত ধরে মহা আনন্দে ছুটে গেল গাঁয়ে। গেল না শুধু একদল লক্ষ্মীছাড়া হা-ঘরে মানুষ, গাঁয়ে যাদের নিজের বলতে কিচ্ছু নেই। স্টেশনের মাটি কামড়ে তারা পড়ে থাকল। এদের নিয়ে তৈরি হলো দুঃসাহসী ডাকাতের দল। পেটের জ্বালায় মালগাড়ি লুট করতে গিয়ে লুটপাটই এদের জীবনের পেশা হয়ে দাঁড়াল।

আজ এখানকার বিরাট অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে এদের মাকড়সার জাল। শুধু মালগাড়ির ধানচাল নয়, পথচলা মানুষের জানপ্রাণ লুটতেও এরা পিছপা নয়। এদের চোরাই মাল গোরুর গাড়িতে করে দোকানে চালান যায় গ্রাম-গ্রামান্তরে। যাদের সঙ্গে একদিন পথের ধুলোয় পাশাপাশি শুয়ে এরা অনাহারে মৃত্যুর দিন গুনেছিল, তাদের কাছে এখন নির্লজ্জ দামে কাপড় বেচতেও এরা কসুর করে না।

কাছেই রেলের লাইন। একটা ট্রেনের বাঁশি শোনা গেল। তারপর ট্রেনের ঝক-ঝক-ঝক-ঝক -ঝক-ঝক-ঝক-ঝক শব্দের মধ্যে তাল কেটে গিয়ে কয়েকটা ধপ-ধপাস ধপ-ধপাস শব্দ হলো।

লোকটা গল্প থামিয়ে বলল, শুনলেন তো? চলন্ত গাড়ি থেকে চোরাই মালের বস্তা পড়ছে।

একটু পরে হঠাৎ দূরে গেটটার কাছে হারিকেনের আলো। আলোয় মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু লালপাড় একটা শাড়ি দেখা গেল। পেছনে আরও কয়েকটা ছায়ামূর্তি। তাদের মাথায় ভারী মোট। গেটটা খুলে পাতানো ছেলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে শাড়ি পরা মূর্তি ফুর্তিতে চেঁচিয়ে উঠল—'ওরে শরৎ বসু খালাস পেয়েছে রে, থানার দারোগাবাবু বলল।' শুনে বুঝলাম এই নারীমূর্তিই মরে যাওয়া বীরকন্যা।

যে এতক্ষণ গল্প বলছিল, সে হঠাৎ আওয়াজ শুনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে গেটের দিকে ছুটে গেল। গিয়ে কী যেন ফিস ফিস করে বলতেই পেছনের ছায়ামূর্তিগুলো তাড়াতাড়ি অন্ধকারের দিকে সরে গেল। একটু পরে মা আর ছেলে লণ্ঠন নিয়ে লম্বা উঠোনটা পেরিয়ে দাওয়ায় এসে উঠল।

দাওয়ায় উঠতেই পুরো মুখটা এবার আলোয় দেখতে পেলাম। এমন বীভৎস ক্রূর মুখ দেখব ভাবতেই পারিনি। এক যুগ আগে এই মুখেই কি জ্বলে উঠেছিল স্বাধীনতার অগ্নিবর্ণ শপথ?

বানিয়ে বললাম, হয়তো আমাকে মনে নেই। তিরিশ সালের আন্দোলনের কথা মনে আছে আপনার?

মুহূর্তের জন্যে বীভৎস মুখের চেহারা বদলে গিয়ে খুব করুণ দেখাতে লাগল। দুটো ম্লান চোখ স্মৃতির মধ্যে কী যেন খুঁজতে চেষ্টা করল। তিনরঙা একটা নিশান আর তার নীচে হাজার হাজার মানুষের লম্বা একটা মিছিল বুঝি ঝিলিক দিয়ে গেল অন্ধকারে। মুহূর্তের জন্যে বিষকন্যার মুখে দেখতে পেলাম শুধু একযুগ আগে বীরকন্যাকেই নয়, বিয়াল্লিশের বুলেট-বেঁধা মাতঙ্গিনী হাজরাকে।

কথা বেশি জমল না। অন্ধকারেই রওনা দিলাম স্টেশনের দিকে। কাঠের গেটটা পেরিয়েই দেখলাম বেড়ার ধারে এক কোণে কতকগুলো বস্তার ওপর বসে অপেক্ষা করছে একদল ছায়ামূর্তি। একটু আগে শোনা দুঃসাহসী দল গড়ার কাহিনি, চলন্ত ট্রেন থেকে ধপাস ধপাস শব্দ, থানার দারোগার গল্প—মনে মনে সব কিছু মালার মতো গেঁথে নিলাম। বুঝতে একটুও দেরি হলো না—আমি ঢুকেছিলাম ডাকাতদলের খাস আস্তানায়। অন্ধকারে গায়ে কাঁটা দিয়ে মধ্যমণির মতো জ্বল জ্বল করে উঠল একটা বীভৎস মুখ।

—সে মুখ মরে যাওয়া বীরকন্যার।

মেদিনীপুর যে মরে যাচ্ছে। মরে যাচ্ছে শাল-মহুয়ার ছায়া। তাম্রলিপ্ত শ্মশান আজ, নগর চন্দ্রকোণা অরণ্য।

যারা ইংরেজের শিকল পরেছিল সকলের শেষে, সেই চুয়াড় বিদ্রোহীরা কোথায় আজ? কোন শমীবৃক্ষে তোলা আছে তাদের অস্ত্র?

খালের দুধারে নরকঙ্কালের মিছিলে কবে জীবন জেগে উঠবে?

পাতালপুরীর রাজ্যে

আসানসোল থেকে বাসে বাংলার পশ্চিম দুয়ার বরাকরে চলেছি। বাইরে চোখ চাওয়া যায় না। আগুনের মতো জ্বলছে রাঢ়দেশের রুক্ষ মাটি। যতদূর দৃষ্টি যায়, একটা গাছেরও ছায়া নজরে আসে না। পুব-পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে বিশাল প্রান্তর জুড়ে সঙিনের মতো উঁচিয়ে আছে কারখানার চিমনি আর কয়লাখনির চাকাজড়ানো উদ্ধত হাঁ-মুখ। দূরে আকাশের কোল ঘেঁষে কল্যাণেশ্বরী পাহাড়। ঢেউখেলানো মাটি সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে সামনে। মাঝে মাঝে বিরাট গর্ত হয়ে ঝুলে পড়েছে রোদে-পোড়া মাঠের সবুজ। চড়াই-উতরাই রাস্তা। রাস্তার ওপর দিয়ে গেছে মালগাড়ির অসংখ্য লাইন। ফুরিয়ে-যাওয়া খনির বাইরের খোলসটা জানিয়ে দেয় এককালে এখানেও খনি ছিল। মরচে পড়া লোহার লম্বা লম্বা খুঁটি আর রং চটা ইটের ভাঙা ভাঙা দেয়াল ফাঁকা মাঠে খসে পড়া মাটির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। বড়ো রাস্তার দুপাশে সার সার দোকান, কাত হয়ে পড়া মেটে ঘরের মজুর বস্তি। লোক গিজগিজ মাছি ভনভন পচাইয়ের দোকানের সামনে ধুলোর মধ্যে বসে ডালমুট আর পাকৌড়ির ফেরিওয়ালা।

বরাকরে পৌঁছোতে সন্ধে হয়। রেললাইনের ওপারে মানবেড়িয়া গ্রামে আমাদের ইউনিয়ন অফিস। পাশ দিয়ে গেছে সরু সুতোর মতো বরাকর নদী। এপারে বর্ধমান, ওপারে মানভূম। বাংলার শেষ, বিহারের শুরু। ওপারে মাইকার পাহাড় রোদ্দুরে চিকচিক করে।

মানবেড়িয়া গ্রাম কে বলবে? পিচের রাস্তার ওপর ঝুলকালিমাখা কোঠাবাড়ি। জলের কল। ইলেকট্রিক লাইট। রাস্তায় পা পাতা যায় না এত ভিড়। গাঁয়ের মধ্যে যেন শহর উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

শুনলাম বরাকর বাজারে সেদিন যাত্রাগান হবে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে ছুটে গেলাম মাইলটাক পথ। ও হরি! গিয়ে দেখি যাত্রা নয়, রামলীলা। লেজওয়ালা হনুমান হাত-পা ছুঁড়ে হিন্দুস্থানিতে কী সব আওড়াচ্ছে। তাই দেখতে শহর ঝেঁটিয়ে লোক এসেছে। অবাক লাগল—এ কেমন বাংলাদেশ! বরাকরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দেখলাম বাঙালিয়ানার চিহ্ন নেই। দোকানে দোকানে হিন্দি হরফের সাইনবোর্ড। শহরের সমস্ত লোকই প্রায় অবাঙালি।

কিন্তু বাংলার আর কোথাও এমন অপরূপ রাত্রি খুঁজে পাবে না। যেদিকে তাকাও মাঠের পর মাঠ জুড়ে আলোয় আলো রাত্রি। মনে হয়, আকাশের তারাগুলো উড়ে এসে বসেছে মাঠে মাঠে। দূরে আসানসোল স্টেশনের সার্চলাইট দেখা যায়—বারবার আকাশ প্রদক্ষিণ করে কী যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।

রাত্তিরে শুতে গিয়ে অবাক। ঠুং-ঠাং ঠুং-ঠাং শব্দ কীসের? মেঝে থেকে মাথা তুলতেই আর শব্দ নেই। খিল খুলে বাইরে এলাম। রাস্তা নিশুতি। সামনের মাঠ পেরিয়ে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে বালতোড়িয়া কোলিয়ারি।

মাটির নীচে সুড়ঙ্গ গেছে। দিন নেই, রাত নেই—আলোবাতাসহীন সেই সুড়ঙ্গ থেকে কয়লা তোলে খনির মজুররা। ঠুং-ঠাং শব্দ কি সেই পাতালপুরীর?

পরদিন সকালে একেবারে অন্য রকম মনে হয় বরাকরকে।

মাঠটা বিষ্ঠায় ভরে আছে। দুর্গন্ধে টেকা যায় না। কোলিয়ারির ঠিক পাশ দিয়ে গেছে মালগাড়ির লাইন। সামনেই কলের চালুনিতে কয়লা ঝাড়াই হচ্ছে। লোডিং কামিনরা সেই কয়লা ছোটো ছোটো টুকরিতে করে মালগাড়িতে বোঝাই করছে। মেয়ে মজুরদের বলে কামিন; কয়লা যারা বোঝাই করে তাদের বলে লোডিং কামিন। গা দিয়ে তাদের ঘাম গড়াচ্ছে; কয়লার গুঁড়ো লেগে চোখগুলো লাল টকটকে হয়ে আছে। সারাদিন খেটেও এরা মাস গেলে পনেরো টাকাও মজুরি পায় না।

রেললাইনের এপারে-ওপারে দুটো কুলি বস্তি। উপর-ধাওড়া আর নীচু-ধাওড়া। বস্তিকে ওরা বলে ধাওড়া। এই ধাওড়াগুলো কী চিজ বাইরে থেকে একদম বোঝা যায় না।

উপর-ধাওড়ায় উঠতেই একটা জলের কল। কলের সামনে পর পর উপুড় করা প্রায় পাঁচশো কলশি। দোকানে কাপড় কিনতে লোকে যেমন কিউ করে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনি মানুষের বদলে কলশিগুলো দাঁড়িয়ে আছে দু-ফোঁটা জলের জন্যে। উপর-ধাওড়ায় লোক থাকে হাজারখানেকের কিছু বেশি। তাদের জন্যে দুটো মাত্র জলের কল। তাও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কলের জল থাকে মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা। একফোঁটা জলের জন্যে অনেক সময় রক্তারক্তি পর্যন্ত হয়ে যায়।

বাতিঘরের কাছে এসে দেখলাম রাতের পালি শেষ করে দলে দলে মজুর আর কামিনরা খাদ থেকে ওপরে উঠছে। সর্বাঙ্গে তাদের কয়লার গুঁড়ো যেন কেটে বসেছে। মাটির নীচের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে তারা উঠে আসছে। উঠেও শান্তি নেই। একফোঁটা জলের জন্য ছটফট করতে হবে সারাটা দিন।

মুদিখানার রোয়াকে দেখলাম বিশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে মড়ার মতো পড়ে আছে। মাটির নীচে আট ঘণ্টা এক নাগাড়ে খেটে কিছুক্ষণ হল সে ওপরে উঠেছে। ছোটো ভাইটা জল ধরে রাখতে পারেনি; তাই ছায়ায় শুয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। আজ আর তার স্নান হবে না। কয়লামাখা শরীর নিয়েই সন্ধেবেলায় আবার খাদে নামতে হবে।

ধাওড়াগুলোর মাঝখান দিয়ে গেছে ছোটো অপ্রশস্ত গলি। দুপাশে স্তূপাকার জঞ্জাল। নর্দমার বালাই নেই। গলির মধ্যে ঢুকলে পেচ্ছাপের তীব্র ঝাঁঝে দম বন্ধ হয়ে আসে। এখানে একদিন থাকলে নরকবাসের ভোগান্তি কী হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়।

ঘর তো নয়, অন্ধকূপের মতো ছোটো ছোটো পায়রার খোপ। একটা মাত্র দরোজা। জানলার বদলে ছাদের ঠিক নীচে দুটো ঘুলঘুলি। ছোটোবেলায় এক মফস্সল শহরে মেথরপাড়ায় এক শুয়োরের খোঁয়াড় দেখেছিলাম। চারিদিক বন্ধ। তাতে শুধু একটা ছোটো জানলা—সেই জানলা দিয়ে লোহার ফলা গলিয়ে শুয়োর মারা হতো। আর অসহ্য যন্ত্রণায় শুয়োরগুলো ছটফট করত। ধাওড়াগুলো দেখে কেবলি আমার সেই শুয়োরের খোঁয়াড়গুলির কথা মনে হচ্ছিল। একেকটা ঘরে শুধু একটা নয়, দুটো-তিনটে পরিবার তাদের পঙ্গপাল নিয়ে থাকে। আর তাদের পাশে শুয়ে থাকে ছাগল, শুয়োর, হাঁস, মুরগি সবকিছু।

দরোজার বাইরে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কাঁচা কয়লার উনুন সর্বদা জ্বলছে। ঠিক পাশেই ছোটো ছোটো উলঙ্গ শিশুরা ধুলোর মধ্যে হামাগুড়ি দিচ্ছে। তাদের দেখবার কেউ নেই– বাপ-মা দুজনেই গেছে কাজে। ঘরের মধ্যে তাদের সম্পত্তির মধ্যে আছে শুধু দুটো-চারটে মাটির হাঁড়ি। গরম ভাতের সঙ্গে একটু হলুদগোলা নিরামিষ ঝোল—এই হচ্ছে ওদের খাওয়া। আর এই খেয়ে ওরা দিন নেই রাত নেই ভূতের মতো খাটে।

না খেটে যে উপায় নেই। দু-তিন পুরুষ আগে যজ্ঞেশ্বর তুরীদের এখানে ঘরবাড়ি ছিল, জমিজমা ছিল। সব খুইয়ে এখন তারা বাপবেটায় এসে খনিতে কাজ নিয়েছে।

জামুরিয়া থানার পরিহারপুর গ্রাম কীভাবে উঠে যাচ্ছে, তা আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। উঠে যাবার নোটিশ এসেছে পরিহারপুরের বাসিন্দাদের ওপর। তারা উঠি উঠি করে উঠতে পারছে না। অনেকদিনের স্মৃতি জড়ানো গাছ, ডোবা। জায়গাজমির মায়া কাটাতে কষ্ট হয়। দু-দিন পরে যজ্ঞেশ্বর তুরীর মতনই তাদের অবস্থা হবে। খনির মালিকের কাছ থেকে তারা নামমাত্র ক্ষতিপূরণের টাকা পাবে। তারপর পেটের জ্বালায় খনিতেই কাজ নিতে হবে।

খনির নিজস্ব হাসপাতাল আছে। এই হাসপাতালকে মজুররা যমের মতো ভয় করে। যার মৃত্যুভয় নেই, সেই শুধু এই হাসপাতালে আসে। আর কেউ হাসপাতালের ছায়া মাড়ায় না। হাত-পা কেটেকুটে গেলে মজুররা অনেক সময় হাসপাতালে আসে। দুর্ঘটনায় কারো অঙ্গহানি হলে মালিক তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে আইনত বাধ্য। কিন্তু সে আইন বড়োলোকের জন্যে—গরিব লোকের জন্যে নয়।

ট্যান্ডেল কুলির কাজ করত কেষ্ট তেলি। বাতিঘরে লোহার ফটক পড়ে বছরখানেক আগে বেচারার ঘাড়টা চিরকালের মতো বেঁকে গেল। একটা চোখও কানা হলো। কিন্তু মামলা করেও আজ পর্যন্ত সে কোম্পানির কাছ থেকে তার পাওনা এক পয়সাও আদায় করতে পারেনি।

মাথার ওপর সময় সময় কয়লার চাপ ধসে, হঠাৎ হঠাৎ গ্যাস হয়ে হামেশাই খাদের নীচে মানুষ মারা যায়। খাদের নীচে যারা কাজ করে প্রাণ হাতে করে কাজ করতে হয়। এছাড়াও যা সব খুনজখম হয়, তা শুনলে গায়ে কাঁটা দেবে। কয়লাখনির ঠিকেদার, ম্যানেজার সবাই প্রায় সাহেবসুবেরাই হয়ে থাকে। তাদের দয়ামায়া বলে কিছু নেই। জানোয়ারের চেয়েও বেশি হিংস্র এরা। এদের বদখেয়ালের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে, তার নিষ্কৃতি নেই। এদের হাতে একদল গুণ্ডার সর্দার থাকে। মনিবের একটু ইশারা পেলেই তারা যে-কোনো কুলিকামিনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে। পাতালপুরির রাজ্যে তাঁদের তাই অসীম দাপট। যারা খুন হয় তাদের লাশও নাকি খুঁজে পাওয়া যায় না।

বছর দুই আগে বালতোড়িয়া খাদে এমনি এক মুনশির লাথিতে মরেছিল হলেজ খালাসি ত্রিভঙ্গ রায়। ত্রিভঙ্গর লাশ লুকিয়ে ফেলতে পারেনি। ত্রিভঙ্গই ছিল সংসারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ। কোম্পানির নামে ত্রিভঙ্গর বউ খেসারত চেয়ে নালিশ রুজু করেছিল। ত্রিভঙ্গর জীবনের দাম সাব্যস্ত হয়েছিল আটশো টাকা। কিন্তু এক বছরে ওর মামলা চালাতেই নাকি আটশো টাকার ওপর খরচ পড়ে গিয়েছিল। ত্রিভঙ্গর বাড়ির কেউ বেঁচে থেকে সে টাকা নিতে পেরেছিল কিনা জানি না।

খনির ভেতরের খবর বাইরের বিশেষ কেউ জানে না। কর্তৃপক্ষের বিশ্বস্ত ও চেনাশুনো লোক ছাড়া বাইরের কেউ খনির নীচে নামতেও পারে না। কাজেই লুকিয়ে খাদের নীচে নামার ব্যবস্থা করতে হলো। একজন মুসলমান সর্দারের সঙ্গে কথা হলো। সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। বলতে হবে 'দেশকা আদমি'। চশমা খুলে রেখে যেতে হবে, শার্টের বদলে গেঞ্জি আর ধুতির বদলে লুঙ্গি পরতে হবে। রাত্তির তিনটের সময় দাঁড়াতে হবে বাতিঘরের সামনে। মালিকের লোক চিনে ফেললে বিপদ হতে পারে।

লিফটের মতো বিরাট কপিকলটা বাইরের আলো ছেড়ে বিদ্যুৎবেগে যখন নীচে নামে, তখন হঠাৎ অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে আসে। চোখে জমাট অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখা যায় না। নামতে নামতে মনে হয় যেন কোথায় কোন পাতালে তলিয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীর জল-বায়ু-মাটির জন্যে মনপ্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। হঠাৎ পায়ের নীচে কপিকলটা ঘটাং করে আটকায়। হাতে আপাদমস্তক ঢাকা সেফটি ল্যাম্প আর কাঁধে গাঁইতি নিয়ে সবাই নেমে দাঁড়ায়।

খাদের গা দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। গোলকধাঁধার মতো অসংখ্য সুড়ঙ্গ চলে গেছে ডাইনে বাঁয়ে। মোড়ে মোড়ে হাওয়া চলাচলের খোলা দরোজা। একটু দূরে দূরে ইলেকট্রিক আলো।

কয়লা কাটার নানা রকমের ব্যবস্থা। কেউ ড্রিল-মেশিনে কয়লা কাটছে, কেউ ডিনামাইট দিয়ে ধসিয়ে দিচ্ছে কয়লার বড়ো বড়ো চাংড়া, কেউ গাঁইতি দিয়ে কয়লা চটাচ্ছে। যারা বারুদের আওয়াজ করে কয়লা 'গিরিয়ে' দেয়, তাদের বলে শর্ট-ফায়ারার। খাদমজুরদের বলে, মালকাটা। এখানে এক রকমের কিম্ভুত ভাষা গড়ে উঠেছে। না বাংলা, না হিন্দি, একরকমের পাঁচ মিশেলি ভাষা। এখানকার বাঙালি কুলিকামিনরাও সেই ভাষাতেই কথা বলে। খাদের নীচে টবে কয়লা ভরতির পর সেই টব দড়ির কলে ওপরে তোলে হলেজ খালাসিরা। টব টেনে তোলার জন্যে আলাদা আলাদা লাইনপাতা সুড়ঙ্গ। সেই লাইন ঠিক রাখার জন্যে আছে সাফাই কুলি। ভরতি টব ঠেলে নিয়ে যাওয়া আর খালি টব মালকাটাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ টালোয়ানদের। ওপরের কয়লার চাপ ভেঙে পড়ার মতো হলে কাঠের ঠেকো দেয় যারা, তাদের বলে কাঠমিস্ত্রি। এছাড়া রাজমিস্ত্রিও আছে; তাদের কাজ ইটের গাঁথুনি দেওয়া। খাদের নীচে চোঁয়ানো জল মারার জন্যে আছে পাম্প খালাসি আর বেলিং খালাসি। বেলিং খালাসিরা হাতে করে ঝুড়ি আর বালতি দিয়ে জল মারে।

এদের সকলের ওপর খবরদারি করে পিট-সরকার, ইনচার্জ আর ওভারম্যান। এদের দস্তুরমতো ঘুষ না দিলে কয়লাখাদে কারো বাঁচার ক্ষমতা নেই। পাতালপুরীর কোটাল এরা।

পদে পদে দুর্ঘটনা বাঁচিয়ে খাদমজুরদের কাজ করতে হয়। এক মুহূর্ত অসতর্ক হলে বিপদ অনিবার্য। এক একজন মজুর এক পালিতে খেটে যা রোজগার করে তাতে পোষাতে পারে না। তাই দু-পালিতে একসঙ্গে আঠারো ঘণ্টা বিশ ঘণ্টা খাটতে হয় অনেককে। খাদে যারা কাজ করে, বেশিদিন তারা বাঁচে না। হুকওয়ার্ম, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ আর নিউমোনিয়া খনি অঞ্চলে সঙ্গের সাথি।

খাদের নীচে একটানা সুড়ঙ্গ চলে গেছে। সুড়ঙ্গকে বলে সুঁদ। সুঁদের মধ্যে মাথা নীচু করে হাঁটতে হয়। না হলে যে-কোনো সময়ে শক্ত পাথরে মাথা ঠুকে যাবার সম্ভাবনা।

অভ্যেস না থাকলে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। কয়লার গুঁড়োয় দম আটকে আসে।

যখন ওপরে এলাম, সকাল হতে বেশি দেরি নেই। মনে হলো দু-ঘণ্টার জন্যে যেন নরকবাস করে এলাম।

সামনে কয়লাখাদে কুলিদের ধাওড়াগুলো নজরে পড়ল। সকালের পালিতে যারা কাজে যাবে, তারা জেগে উঠেছে। পেটে খিদে নিয়ে এক নরককুণ্ড থেকে আর এক নরককুণ্ডে চলেছে তারা।

তার একপাশে সাহেব ঠিকেদারের আর ম্যানেজারের বাংলো। সামনে লাল-লাল ফুলের বাগান। মনে হল হাজার হাজার মজুরের বুকের রক্ত ওদের বাগানে ফুল হয়ে ফুটে আছে।

খনির মজুররা এতদিন বুঁজে সব সহ্য করে এসেছে। ওপরের দিকে অসহায়ভাবে হাত তুলে নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছে। আজ আর সেদিন নেই। খনির অন্ধকারেও আলোর খবর পৌঁছোচ্ছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দল তৈরি হয়েছে খনিমজুরের। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের রক্ত আজও শিরায় শিরায় বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যারা, আস্তে আস্তে তারা অন্ধকারে উঠে দাঁড়াচ্ছে। বীরসা মুন্ডার বংশধরেরা ভগীরথের মতো মাটির নীচে বয়ে নিয়ে যাবে রক্তগঙ্গাকে। পিতৃপুরুষের ক্ষুধিত আত্মাকে তৃপ্ত করবে তারা। তাদেরই দিকে তাকিয়ে খনিমালিক সাহেবদের বাগানের লাল ফুল লাল আগুন হয়ে জ্বলে উঠবে। দেরি নেই।

কলের কলকাতা

... কলের কলকাতা রে ভাই, কলের কলকাতা। হেই চলে হাওয়াগাড়ি হুস হুস। ট্রাম চলে ঠন ঠন। রাস্তায় এই লোক তো এই লোক। বাস রে, সে কী আজব শহর। কী দেখলাম কওয়া যায় না। কত যে বাড়ি, কত যে গাড়ি, বাস রে! কোত্থাও মাটি নাই, কোত্থাও সাঁকো নাই—শুধু চুন-বালি-ইট আর শুধু পাথর। কলের কলকাতা রে ভাই, কলের কলকাতা। কল খুললে জল, কল টিপলে আঁধারে ভাই জ্যোচ্ছনা ফিনিক দেয়। রাত রাত নয়, দিন দিন নয়। বাস রে, সে কী আজব শহর! কী দেখলাম কওয়া যায় না। কত যে গলি, কত যে মোড়, বাস রে—যতই ঘুরি মাথা বনবন, পা কনকন করে। হঠাৎ দেখি আমার ছায়া। তার পাশে ষণ্ডামার্কা লম্বা চওড়া আরও একটা ছায়া। পেছনে কে রে? দেখে তো আমি ভিরমি যাই। ইয়া ইয়া গোঁফ, ইয়া ইয়া দাড়ি। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। হাতে লম্বা লাঠি। বুকে ঝুলছে পাঞ্জাবির ওপর হাতকাটা রংচঙে একটা ফতুয়া। কাঁধে ঝোলানো একটা ঝুলি। ছোটো ছেলে দেখেছে কি কপাৎ। ঠকঠক করে কাঁপি আর ইষ্টনাম জপি। হঠাৎ লোকটা এগিয়ে যায়। নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি। নইলে এতক্ষণে কোন মুল্লুকে হাওয়া। বসে বসে হিং খাচ্ছি, হিং-টিং-ছট শুনছি। বাস রে, সে কী আজব শহর! কী যে দেখলাম কওয়া যায় না। দু-পাশারি দোকান দু-পাশারি হাট—গাড়ি চাইলে গাড়ি, বাড়ি চাইলে বাড়ি। যা চাইবে তাই পাবে। বাস রে, কী আজব শহর!...

—পঁচিশ বছর আগে কালীঘাট থেকে পৈতে নিয়ে দেশে ফিরে এসে কলকাতার গল্প বলেছিল মোনা ঠাকুর। তাও কি বলতে চায়? যুদ্ধের সময় পুঁচকে আলপিনেরও যেমন দাম বেড়ে যায়, কলকাতা থেকে ফিরে তেমনি দাম বেড়ে গেল মোনা ঠাকুরের। মাটিতে যেন পা পড়তে চায় না। নইলে রোগাপটকা ছেলেটাকে কে পুঁছত? টোকা মারলে যে চিতপটাং হয়ে উলটে পড়ে, পেয়ারা গাছে উঠতে হাঁটু কাঁপে—পৈতে নেবার পর তার কান- বেঁধানো

ন্যাড়া মাথাটায় তেরে-কেটে-তাক বলে তবলা না বাজিয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা মধুকুলকুলির মগডাল থেকে চুরি করে পাড়া আস্ত দুটো আম ঘুষ দিয়ে তার কাছ থেকে গল্প শুনতে হলো! তাও একদিনে নয়। টিপে টিপে সে তার পুঁজি ভাঙল। গরজ বড়ো বালাই। তাই রয়ে সয়েই শুনতে হলো। কলকাতার গল্প না শুনে পেট আমাদের ফুলে উঠেছিল না।

কিন্তু এমন যে আজব শহর কলকাতা যেখানে কল খুললে জল, কল টিপলে জ্যোচ্ছনা ফিনিক দেয়—দু-দিন যেতে না যেতেই সে শহর ছেড়ে এ পোড়া দেশে ফিরে আসতে হলো কেন? সে গল্পও বলেছিল মোনা ঠাকুর।

...কোত্থাও কিছু নাই, হঠাৎ খুন চাপে শহরটার মাথায়। মাথা খারাপ শহরটার। ফট ফট বন্ধ হয় দরজা আর জানলা। বড়ো বড়ো দালান যেন হানাবাড়ি। বুঝা যায় না মানুষজন আছে কি না আছে। রাস্তা ফাঁকা। রাত আঁধার। কানে তালা লাগে হল্লায়: হা রে রে রে রে রে! মুসলমানগুলাকে কাটব। হা রে রে রে রে রে রে! হিন্দুগুলাকে কাটব। ছুরি বার হয়, লাঠি বার হয়। লেগে যায় নারদ-নারদ। সে কী রক্ত, সে কী আগুন বাস রে। লাশ গড়ায় রাস্তায়। ভয়ডর নাই কিন্তু সাহেবদের। তারা মিটি মিটি চায় আর ফিকফিক হাসে। হিন্দুও ছুঁবে না তাদের, মুসলমানও ছুঁবে না। রাজার জাত তো। গায়ে হাত দেয় সাহস কার? এই না দেখে ধর্মশালার যাত্রী সব ভয়ে কাঠ। বলে প্রাণ নিয়ে পালাই। হাঁ-হাঁ করে আসে পান্ডারা। যাত্রীদের টাঁকের দিকে তাকায় আর বলে : আহা-হা, ভয় কীসের? আমরা আছি, ভয় কীসের? শোনে না কেউ। খ্যাপা শহর। কিচ্ছু মাথার যদি ঠিক থাকে। এই ঠান্ডা তো এই গরম। বাস রে! কখন কী হয় কি বলা যায়? ছ্যাকরা গাড়িতে না উঠে, দরজা-জানলায় খড়খড়ি ফেলে সেই রাত্তিরে সব দে ছুট।...

বছর পাঁচেক পর নিজের চোখে দেখলাম সেই আজব শহরকে। মোনা ঠাকুরের সেই কলের কলকাতা।

ইস্টিশান থেকে কোথা দিয়ে কেমন করে এলাম কিছু মনে নেই। যেন এক আলো জ্বলা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকলাম—এইটুকু মনে আছে। চারদিকে প্যাকিং বাক্সের মতো গাদা গাদা বাড়ি। একটার সঙ্গে একটা যেন আঠা দিয়ে সাঁটা।

পরদিন কলের জল আর বাসন মাজার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। পরিত্রাহি কাক ডাকছে কা-কা-কা। রোদ্দুর দেখা না গেলেও সকাল না হয়ে যায় না। দরজার খিল খুলে বাইরে দাঁড়াতেই অবাক। সামনে কানাগলির মোড়ে দোতলা-সমান উঁচু টেলিফোনের তার ঠিক যেন মুক্তোর মালার মতো দেখাচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের অগুনতি আয়নায় মুখ দেখছেন সাত রঙের সাত ঘোড়ায় চাপা সূর্যদেব।

কিন্তু যত যাই বলো সে খোলা মাঠ আর নীল চোখের মণির মতো আকাশের কাছে প্যাকিং বাক্স-মার্কা এই শহর কিচ্ছু না। গলির মোড়ে ফুটো পয়সার মতো এই আকাশ। তাও দাঁড়িয়ে দেখার যো নেই। পেছন থেকে ভিড় এসে ঠেলে নিয়ে যাবে। কী বিচ্ছিরি শহর, বাবা। এমন শহরে থাকতে আছে! গোমড়ামুখো লোকগুলো সব ঘাড় হেঁট করে ঘুরে বেড়ায়! একবার কেউ ডেকে জিজ্ঞেসও করে না—কেমন আছো হে! মনে মনে চটে যাই মোনা ঠাকুরের ওপর। একটা আস্ত দামড়া গাধা। এর চেয়ে ভালো ছিল আমার ডুগডুগির হাট, দুধপাতলার মাঠ। ঢের ভালো ছিল আমার ইচ্ছামতী নদী। উঁচু পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে বুক টান করে ঝাঁপ দাও, ডুব দিয়ে শামুক তোলো। চনচনে ক্ষিধে। তার কাছে সরু সুতোর মতো কলের জল—ছোঃ।

দম-দেওয়া কলের পুতুলের মতো যে-মানুষগুলো সকাল বেলায় রাস্তা দিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে গেল, বিকেলে দেখি তাদের দম গেছে ফুরিয়ে। কালিঝুলি মেখে আস্তে আস্তে পা ফেলে টলতে টলতে ফেরে। গাঁয়ে এমন সময় নীলকুঠির মাঠ থেকে গোরুর পাল পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে ফিরত। আর পশ্চিম দিকের আকাশটায় এইসময় কারা যেন সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিত।